# বাজনা

শৈলেন ঘোষ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শ্রীবিমল দাস

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মে ১৯৬২
তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ১৯৬৪

বাজনার মত
আমার দুরন্ত বন্ধুদের

# বাজনা

মা আদর করে নাম রেখেছে বাজনা।

বাজনা একটি ছোট্ট ছেলে।

নাক চ্যাপ্টা ছেলেটার চোখ দুটো কেমন গোল গোল! দুষ্টুমি মাখা!

দাঁত ফোকলা ছেলেটার গাল দুটো কেমন ফুলকো! যেন আস্কে পিঠে! উফ! কী দুষ্টু! ছেলে নয়তো দস্যি!

বাজনা। নাম শোন! হাসি পায় না? আহা! বুঝি আর নাম ছিল না ভূভারতে?

বাজনা মায়ের কাছে থাকত। উঃ, বাব্বা! ছেলের জন্যে মা তো জ্বালাতন-পোড়াতন! মায়ের হাড়-মাস একেবারে কালি! মা কত আদর করত, কত বোঝাত, কত গান শোনাত। বয়ে গেছে গান শুনতে। বাজনা কিছুতেই গান শুনবে না। মা গান গাইলেই বাজনা চেঁচিয়ে-মেচিয়ে গল্প বলতে সুরু করে দেবে। শুনতে হবে। নইলে ছাড়ান আছে!

মাকে গল্প বলত বাজনা ল্যাজ-কাটা কুকুরটার। কান-ছেঁড়া ছাগলটার। আর নোলক-পরা হাঁসটার।

আর গল্প বলত,

কার বাড়িতে কুলগাছে কুল ধরেছে।
কাদের ঘরে জামগাছে জাম ফলেছে।
কার বাগানে আমগাছে আম পেকেছে।

গল্প বলতে বলতে রাত আসত। বাজনার ঢুল আসত। ঘুমিয়ে পড়ত।

মা চেয়ে চেয়ে দেখত বাজনার মুখের দিকে, ঘুমন্ত চোখের দিকে। দেখতে দেখতে চোখের পাতা দুটি ভিজে যায় মা'র। বাজনা সারাদিন দুষ্টুমি করবে। মা কত বকবে। আর এখন? মা সব ভুলে যায়। যতই হোক ছেলে তো! আদর করবে মা ছেলেকে। বলবে "সোনা আমার, চাঁদ আমার।" তারপর মা-ও ঘুমিয়ে পড়বে।

রাত কাটবে।

সকাল। সকাল মানেই তো আলো।

আলোর সকাল প্রথমে আকাশে ছড়িয়ে যায়।

তারপর সকাল নামে আকাশ থেকে গাছের পাতায়।

সবুজ ঘাসে।

রঙিন ফুলে।

নদীর দোলায়।

আর?

বাজনার চোখে।

ঠিক তখুনি মা ডাকল, "বাজনা!"

ঘুম থেকে উঠে পড়ল বাজনা। সাড়া দিলে, "কেন মা?"

মা বললে, "বাজনা, নদীর থেকে এক ঘটি জল এনে দাও তো।"

বাজনা যেন হাতে চাঁদ পেল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, "যাই মা।"

মা বললে, "মাঠে মাঠে ছুটো না যেন!"

"না, না।"

"গাছে গাছে উঠো না যেন!"

"না, না।"

"নদীর জলে নেমো না যেন!"

"না, না।"

"যাবে আর আসবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।" বলে বাজনা কোঁচড়ে মুড়ি নিলে। হাতে ঘটি নিলে। মায়ের জন্যে জল আনতে হাঁটা দিলে।

কেমন হাঁটছে দেখো! যেন কত লক্ষ্মী! ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না!

সবুজ ঘাসে রোদ ছড়ানো। মায়ের চোখের আড়াল হতেই ছুট দিলে বাজনা ঘাসের ওপর দিয়ে।

"বাজনা।" একটু যেতেই কে যেন হঠাৎ ডাকল!

ছুটতে ছুটতে শুনতে পেয়েছে বাজনা। থমকে দাঁড়াল। এদিক ওদিক চোখ ফেরাল। কাউকে তো দেখতে পেলে না। কি জানি, হয়তো ভুল শুনেছে। আবার ছুটল।

"বাজনা।" আবার ডেকেছে! এবার একটু জোরে। না, এবার ঠিক শুনতে পেয়েছে। দাঁড়িয়ে পড়ল বাজনা। "কে রে?" চেঁচিয়ে সাড়া দিলে।

চুপচাপ! এদিক, ওদিক, কোনদিকেই তো কেউ নেই। যাঃ বাবা! ভেল্কি নাকি! একটু দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে যাবে বাজনা, আবার ডেকেছে, "বাজনা।"

"হি-হি-হি!" হেসে ফেলেছে বাজনা। এবার বুঝতে পেরেছে। ঠিক বুঝতে পেরেছে। ছোটটুন! বাজনার বন্ধু। লুকোচুরি খেলা করছে! কিন্তু লুকাল কোথায়?

"ছোটটুন।" বাজনাও হাঁক দিলে।

অমনি খিলখিল করে হেসে উঠেছে ছোটটুন। সামনের বট-গাছটার একটা ডাল বেয়ে ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে।

একেবারে বাজনার সামনে। হাসতে-হাসতেই বললে, "কেমন ঠকালুম!"

"ওরে! তুমি গাছের ওপর!"

"কোথা যাচ্ছ সাতসকালে?" হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে ছোটটুন।

বাজনা বললে, "নদীর ঘাটে, জল আনতে।"

"জল আনতে যাবেখন, এখন আমার সঙ্গে চল।"

"কোথা?"

"এস না।"

"না ভাই, দেরি হয়ে যাবে।"

"দেরি হলে কী হয়েছে। নদীর জল তো আর ফুরুচ্ছে না।" বলেই ছোটটুন আচমকা বাজনার হাত থেকে ঘটিটা ছিনিয়ে নিয়ে দে ছুট। ছুটতে ছুটতে হি-হি করে কী হাসি!

বাজনা থতমত খেয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল, "ছোটটুন, ঘটি দাও।" বলে নিজেও ওর পিছু ছোটা দিলে।

বেশ কিছুটা ছুটে এসেই একটা পেয়ারা গাছ। গাছ ভর্তি পেয়ারা। ডাঁসা-ডাঁসা, পাকা-পাকা।

ছোটটুন বললে, "বাজনা, আমি গাছে উঠছি। তোমার ঘটি নিচে রাখছি।" বলে তরতর করে গাছে উঠে গেল।

আর ঘটি! অত পেয়ারা দেখে কী আর লোভ সামলাতে পারে বাজনা? চেঁচিয়ে উঠল, "ছোটটুন, আমিও উঠছি।" উঠে পড়ল গাছে।

সবচেয়ে বড় পেয়ারাটা একেবারে আগডালে। ছিঁড়ে নিলে বাজনা। কামড় দিলে।

ছোটটুন বললে, "কি বাজনা, কেমন লাগছে?"

"খুব মিষ্টি।"

"তবে যে আসছিলে না!"

"আমি কী আর পেয়ারার কথা জানতুম!"

"মায়ের জন্যে নেবে না বাজনা?"

"নেব।"

বাজনা আর দুটো বড় বড় পেয়ারা মায়ের জন্যে কোঁচড়ে নিলে। আর দুটো নিজে খেলে।

ছোটটুন বললে, "বাজনা, বাজনা, সাধ মিটেছে?"

বাজনা বললে, "সাধ মিটেছে। এবার ঘাট যাই।"

ছোটটুন বললে, "আমিও ঘর যাই।" বলে, ছোটটুন এডাল ওডাল লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেমে পড়ল। ঘর চলল।

বাজনা আগডাল, মাঝডাল ডিঙিয়ে মাড়িয়ে টপকিয়ে নামল। ঘটি নিয়ে ঘাটে ছুটল।

নদীর ঘাট।

এপার নদী। ওপার নদী। জল চিক-চিক। ঢেউ ঝিক-মিক। কত নৌকো। চলেছে দুলতে দুলতে। মাঝিরা দাঁড় টানছে। হাওয়াতে পাল তুলেছে। কোথা চলেছে কে জানে!

বাজনা হাঁকলে, "ও মাঝি, মাঝিভাই, কোথা যাচ্ছ?"

মাঝি হাঁকলে, "হাটে যাচ্ছি।"

"আমায় নিয়ে যাবে?"

"বড় হও, তারপর।"

"মা বলেছে আমি তো বড় হয়ে গেছি।"

মাঝি শুনতেই পেলে না। পাল-তোলা নৌকো হাওয়ার টানে সোঁ সোঁ করে চলে গেল।

"প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক", নদীর জলে হাঁস দুলছে। রাজহাঁস। ডাক দিচ্ছে। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, সাঁতার কাটছে।

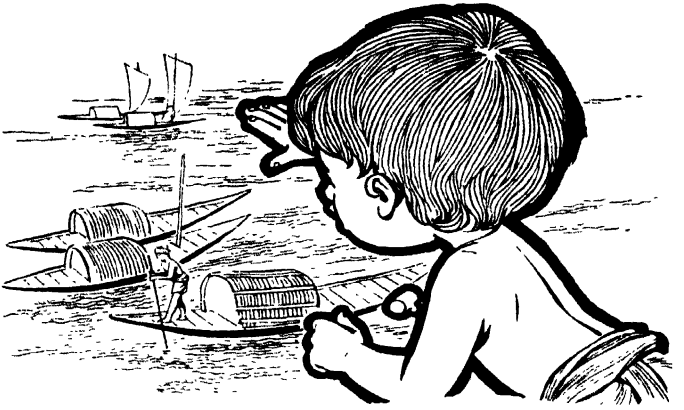

"রাজহাঁস, রাজহাঁস, কোথা চলেছ?" জিজ্ঞেস করলে বাজনা।

সবচেয়ে বড় রাজহাঁসটা উত্তর দিলে, "যাচ্ছি না কোথাও, দোল খাচ্ছি। প্যাঁক-প্যাঁক!"

বাজনা বললে, "আমারও দোল খেতে ইচ্ছে করছে।"

"নেমে পড় না জলে। প্যাঁক-প্যাঁক।"

"মা যে বারণ করেছে জলে নামতে।"

"তবে পাড়ে বসে বসে ঘাস কাটো।"

"কেন, তোমার পিঠে যদি বসি!"

ওমা! কথা শুনে কী জোর হেসে উঠল হাঁসগুলো! "প্যাঁক-প্যাঁক, ফ্যাঁক-ফ্যাঁক।" আবি বাবা! হেসে হেসে জলের ভেতর ডিগ-বাজি খেতে লেগেছে!

বাজনা থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলে, "হাসছ কেন?"

"তোমার কথা শুনে। আমার পিঠে চাপলে তোমার ভার সামলাবে কে? আমিও মরব, তুমিও ডুববে।"

"আমি তো সাঁতার জানি। ডুবব কেন?"

"বেশ তো। তা হলে আমার ঘাড়ে না চেপে নিজে নামলেই পার।"

"না, এখন না। মা রাগ করবে।"

"তবে ঘরে যাওগে। মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে দুধ খাওগে।" বলে হাঁসগুলো প্যাঁক-প্যাঁক করে আবার হেসে উঠল। হাসতে হাসতে পেছন ফিরে চলে গেল।

বাজনা চেয়ে চেয়ে দেখলে সেদিকে একদৃষ্টে। তারপর ঘটিটা বাগিয়ে ধরে, ঘাটে পা বাড়ালে। জলে হাত নামালে। হেঁট হয়ে মুখে জল দিলে। হঠাৎ জলের ছায়ায় নিজের মুখটা ভেসে উঠেছে। ভয় পেয়ে গেল বাজনা। মা বলেছিল, যাবে আর আসবে। ইস! কত দেরি হয়ে গেল!

বাজনা তাড়াতাড়ি ঘটিটা জলে ডুবিয়ে ধুয়ে নিলে। ঘটি ভর্তি জল নিলে। ঘুরে দাঁড়াল। ঘুরে যেই ছুটতে যাবে, হঠাৎ কে যেন ডাকলে তাকে মিহি সুরে, "বাজনা।"

বাজনা চমকে মুখ তুললে, চোখ ফেরালে। কাউকে দেখতে পেলে না।

আবার ডাকল, "বাজনা।"

বাজনার একবার ডানদিকে চোখ। একবার বাঁদিকে কান।

"বাজনা।" ফের ডাকল।

বাজনা পেছনে চাইল।

"ওদিকে নয়, জলের ভেতর।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে বাজনা জলের দিকে চেয়েছে। চেয়েই দেখে একটা এত্তো বড় মাছ। পাখনা দোলাচ্ছে জলের তলায়।

বাজনার চোখ দুটো চকচক করে উঠল। লোভে। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল। যাঃ! টাল সামলাতে পারলে না! হাত বাড়াতে পা ফস্কাল! পা ফস্কে জলের ভেতর চিৎপটাং! ঝপাং!

বাজনা পড়ল জলের ভেতর। ঘটিও পড়ল। কাপড় ভিজল। মাথাও ডুবল।

কোথা ছিল রাজহাঁসগুলো? বাজনাকে চিৎপটাং দেখে প্যাঁক-প্যাঁক, ফ্যাঁক-ফ্যাঁক করে হেসে গড়িয়ে গেল। মাছটা নেচেকুঁদে আহ্লাদে আটখানা। লজ্জায় মরে যায় বাজনা!

হঠাৎ বাজনার খেয়াল হল, ঘটি গেল কোথায়! ভয়ে চমকে ওঠে! যাঃ! হাত থেকে ফস্কে গেছে!

খিলখিল করে হেসে উঠল মাছটা বাজনার ভয়-মাখানো মুখটা দেখে!

"হাসছ কেন?" একটু রেগেই জিজ্ঞেস করলে বাজনা।

মাছ হাসতে-হাসতেই বললে, "আহা! রাগ করলে কী হবে! ঘটি জলের তলায় তলিয়ে গেছে। আর পেতে হচ্ছে না।" বলে মাছটাও সাঁতার দিয়ে জলের নিচে হারিয়ে গেল।

এখন কী হবে! বাজনার ভয়ে মুখ এইটুক।

"যেমনকে তেমন। লোভ করলেই দুর্ভোগ।" বলে মাছটা জলের নিচ থেকে উঁকি মেরে বাজনাকে মুখ ভেঙালে!

হাঁসগুলো হাসতে হাসতে মাঝ-দরিয়ায় ছুট দিলে।

বাজনা জলে জলে খুঁজল। এদিক ওদিক ডুবল। নদী তোলপাড়! ছাই, পেলে তবে তো! ঘটি কি আর আছে! নদীর জলে ভেসে গেছে। হারিয়ে গেছে। তাই তো। কী হবে তা হলে?

খুঁজতে খুঁজতে বেলা বাড়ল। মা ভাবল। বাজনা ঘরে ছুটল।

বাজনাকে দেখে মা বললে, "বাজনা দেরি কেন?"

"মাগো, মা, ছোটটুনটা ডাকল তাই।"

"ছোটটুন ডাকল, তাই বুঝি মাঠে মাঠে ছুটলে? গাছে গাছে উঠলে? কতদিন না বারণ করেছি!" মায়ের চোখে রাগ! "বাজনা, আমার ঘটি কই?"

"মাগো, মা, তোমার জন্যে পেয়ারা এনেছি।"

"পেয়ারা আমার কী হবে? আমার ঘটি কই? জল কই?"

কোঁচড় থেকে একটা পেয়ারা বার করে বাজনা বললে, "দেখো মা, এটা কেমন পাকা!"

মা বললে, "থাক পেয়ারা, তুমি জলে ভিজলে কেন?"

"মাগো, মা, হাঁসটা জলে নাচল কেন?"

"হাঁস নাচলে তোমার কী?"

"মাগো, মা, মাছটা জলে হাসল কেন?"

"মাছ হেসেছে তো কী হয়েছে?"

"আমি যেই ধরতে গেছি, মাছ পালাল। হাত ফস্কে ঘটি হারাল।"

মা বকলে, "বাজনা তুমি দুষ্টু! ছিঃ ছিঃ, কথা শোন না।" বলে মা রাগ করে ঘরে ঢুকে গেল।

বাজনা ছুটে মায়ের কাছে গেল। বললে, "মাগো, রাগ করো না। কাল থেকে ঠিক আমি লক্ষ্মী হব। তুমি যা বলবে, তাই শুনব। ছোটটুন যদি বলে মাঠে মাঠে ছুটতে, ছুটব না। হাঁস যদি বলে জলে জলে খেলতে, খেলব না। মাছ যদি ডাকে জলে জলে ডুবতে, ডুবব না। আমি কারো কথা শুনব না। শুধু তোমার কথা শুনব।" বলে বাজনা মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলে। আদর করে নরম সুরে ডাকলে, "মাগো!"

মা মুচকি মুচকি হাসল।

আজ হাটবার।

মা বললে, "বাজনা, আমি হাটে যাচ্ছি।"

"কখন আসবে?"

"সন্ধেবেলা। তুমি লক্ষ্মী হয়ে ঘরে থাকবে।"

"মাগো, একটু একটু মেঘ করেছে। বিষ্টি নামবে। তুমি টোকাটা সঙ্গে নাও।" বলে বাজনা মায়ের হাতে টোকাটা তুলে দিল।

মা হাটে গেল।

একটু পরে মেঘে-মেঘে ছেয়ে গেল।

একটু পরে কড়-কড়-কড় বাজ পড়ল।

গুড়-গুড়-গুড় মেঘ ডাকল।

বাজনা "দুগ্গা-দুগ্গা" ডাকতে ডাকতে মায়ের কথা ভাবতে লাগল।

তারপর টুপ-টুপ-টুপ বিষ্টি নেমেছে।

বাজনা ভাবলে, "আহারে! মা এখন মাঠে, না হাটে!"

এতক্ষণ ঘরের জানলা বন্ধ ছিল। বাজনা জানলাটা খুলে দিলে।

টুপ-টুপ-টুপ বিষ্টি তখন ঝম-ঝম-ঝম নাচছে।

সবুজ ঘাসে নাচছে।

শিউলি ফুলে নাচছে।

পদ্মপাতায় নাচছে।

আর নাচছে বাজনার মনে।

বাজনা জানলা দিয়ে হাত বাড়াল। হাতের ওপর বৃষ্টি পড়ে টুপ-টাপ!

বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "ও বিষ্টি, বিষ্টি-ফোঁটা, তোমরা কোত্থেকে আসছ?"

একটা বড় ফোঁটা একেবারে বাজনার হাতের ওপর টুপ করে নেমে এল। হাতের ওপর দুলতে লাগল। দুলতে দুলতে বললে, "আমাদের বাড়ি মেঘের দেশে। আমরা আসছি সে-দেশ থেকে।"

"সে তো জানি। না, জিজ্ঞেস করছি আমার মাকে দেখেছ?"

"কেমন দেখতে?"

"বারে! আমার মা আমার মায়ের মতন। কালো চুল মেঘলা। গায়ে শাড়ি কমলা। পান-সুপারি ঠোঁট রাঙানো। মায়ের হাসি মন-জুড়ানো।"

বিষ্টি-ফোঁটা বললে, "দেখেছি।"

"দেখেছ! দেখেছ!" খুশিতে উপচে গেল বাজনার মুখখানা। "কোথা দেখেছ? মাঠে? না, হাটে?"

"তোমার মা মাঠেও না, হাটেও না।"

"তবে?"

"শিব মন্দিরে।"

"কেন?"

শিবঠাকুরকে তোমার মা পুজো দিয়ে কাঁদছেন আর বলছেন, "শিবঠাকুর, শিবঠাকুর, আমার ছেলে দুষ্টু ভারি। তাকে লক্ষ্মী করে দাও।"

বিষ্টি-ফোঁটার কথা শুনে মায়ের মুখখানি বাজনার চোখে স্পষ্ট ভেসে উঠল। ছলছল করে উঠল দুটি চোখ বাজনার। কাঁদো-কাঁদো সুরে বললে, "সত্যি বলছি বিষ্টি-ফোঁটা, আজ থেকে আমি একদম দুষ্টুমি করি নি।"

বিষ্টি-ফোঁটা জিজ্ঞেস করলে, "তোমার নাম কী?"

"আমার নাম বাজনা।"

"বাজনা!" লক্ষ ফোঁটা একসঙ্গে হেসে উঠল, "হা-হা-হা, হো-হো-হো, হি-হি-হি।"

বাজনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "হাসছ কেন?"

বিষ্টি-ফোঁটারা ঝমঝমিয়ে নাচতে নাচতে ছড়িয়ে গেল। হাসতে হাসতে গড়িয়ে গেল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "ছি-ছি-ছি, বিচ্ছিরি-ই-ই, বিচ্ছিরি-ই-ই।"

বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "কী বিচ্ছিরি?"

"বিচ্ছিরি নামটা।"

"কেন?"

"বাজনা আবার কেমন নাম? বাজনা আবার নাম হয়!"

"কেন?"

অমনি বিষ্টি-ফোঁটারা চেঁচালে, "বাজনা তো বাজে।"

"কেমন?"

"যেমন পায়ে নূপুর বাজে,
ঘণ্টা বাজে,
সানাই বাজে,
বাঁশি বাজে,
বীণা বাজে,
ভেঁপু বাজে,
ঢোলক বাজে।

নামটা তোমার বাজে।" বলতে বলতে, হাসতে হাসতে লুটো-পুটি খেতে লাগল বিষ্টি-ফোঁটারা।

লজ্জায় কান লাল হয়ে গেল বাজনার। কাঁপতে লাগল রাগে। রেগেমেগে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল বিষ্টি-ফোঁটাদের। ফস্কে গেল। ফোঁটারা আরও জোরে চেঁচাতে লাগল, "বাজে, বাজে, বাজে।"

বাজনার মনে হল, যেন বিষ্টি-ফোঁটাগুলো হাততালি দিয়ে তাকে ভেংচি কাটছে। শুনতে পারল না। চেঁচিয়ে উঠল বাজনা চিৎকার করে, "না, না।" নিজের কান দুটো দু হাত দিয়ে চেপে ধরল। না, কিছুতেই শুনবে না সে।

না শুনলে কী! বিষ্টি-ফোঁটারা চেঁচাবেই, রাগাবেই।

দুম করে জানলাটা বন্ধ করে দিল বাজনা।

তাতে কী! তাতে কী আর ওরা থামে! যতক্ষণ কালো মেঘ থাকবে আকাশে, ততক্ষণ বিষ্টি-ফোঁটারাও নাচবে মাটিতে!

দু কানে আঙুল দিয়ে চুপটি করে বসে রইল বাজনা ঘরের কোণে।

অনেকক্ষণ পর বিষ্টি থামল। কালো মেঘ সাদা হল। সাদা মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যিঠাকুর উঁকি মারল।

না, আর বিষ্টি নেই, চেঁচামেচি নেই। নাচানাচিও নেই। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। বিষ্টি-ফোঁটারা কেন এমন কথা বললে! সত্যিই কী তার নামটা বিচ্ছিরি! বসে বসে ভাবল বাজনা একটু-খানি। না, বসতে তার ভাল লাগছে না। দাঁড়াল বাজনা। দাঁড়াতেও ভাল লাগছে না। দোর ঠেলে ছুটল বাইরে।

বাইরে আকাশ। রামধনু উঠেছে। চোখ জুড়িয়ে গেল। থমকে দাঁড়াল বাজনা। একদৃষ্টে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। ভাবল, বিষ্টি-ফোঁটারা দুষ্টু ভারি! রামধনু কত মিষ্টি! আহারে! আমার নাম বাজনা না হয়ে যদি রামধনু হতো!

বাজনা আকাশের দিকে ছোট্ট দুটি হাত বাড়াল। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "রামধনু, রামধনু, বল না আমার নামটা বিচ্ছিরি?"

"বিচ্ছিরি! বিচ্ছিরি!" বলে এমন একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল গাছের ফাঁক দিয়ে!

বাজনা শিউরে উঠল। ছুটল সামনে। পুকুরপাড়ে। ডাক দিল, "সোনা-ব্যাঙ, সোনা-ব্যাঙ, আচ্ছা, আমার নামটা বিচ্ছিরি?"

সোনা ছানাপোনা নিয়ে বিষ্টির জলে রা কাড়ছিল। গাবদা-গাবুস গলা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "বিচ্ছিরি! বিচ্ছিরি!"

বাজনা আবার ছুটল। ছুটল নদীর ধারে। হাঁকল, "রাজহাঁস, রাজহাঁস, আমার নামটা বিচ্ছিরি?"

রাজহাঁস সাঁতার কাটছিল নদীর জলে, "প্যাঁক-প্যাক" করে চেঁচিয়ে উঠল, "বিচ্ছিরি! বিচ্ছিরি!"

অমনি মাছগুলোও হেসে উঠল খিলখিল করে। ডেকে উঠল, "বিচ্ছিরি! বিচ্ছিরি!"

বাজনা ছুট দিলে। না, আর কাউকে সে জিজ্ঞেস করবে না। জিজ্ঞেস করতে হলও না। মনে হল সবাই যেন তার পিছু পিছু ছুটছে। সবাই যেন একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে, "বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি!"

কান ঝালাপালা হয়ে গেল বাজনার। থাকতে পারল না। চিলের মত চেঁচিয়ে উঠল, "থামো, থামো তোমরা।"

থামল না কেউ।

ছুটতে ছুটতে ঘরে পেঁছে গেল বাজনা। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে। ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ পর মায়ের মিষ্টি মিষ্টি হাত দুটি যখন বাজনার কপাল ছুঁয়ে গেল, তখন ঘুম ভাঙল। চোখ চাইল বাজনা।

মা হাসছে।

বাজনা হাসল না। উঠে বসল।

মা জিজ্ঞেস করলে, "কী হয়েছে, বাজনা?" চিবুকে হাত দিলে।

বাজনা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মা আদর করলে। বললে, "এই দেখো, তোমার জন্যে হাটের থেকে কী এনেছি!"

মা এনেছে কাঠের ঘোড়া।

বাজনা দেখল না। বললে, "চাই না। আমি তো দুষ্টু!"

"কে বললে তুমি দুষ্টু? তুমি আমার লক্ষ্মী সোনা।"

"লক্ষ্মী না আর কিছু! দুষ্টু বলেই তো আমার নামটা অমন বিচ্ছিরি রেখেছে! বাজনা! নাম না ছাই! আমার ও নাম চাই না, চাই না।" বলে বাজনা মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

"বাজনা!" মা আবার ডাকল। ছেলেকে আদর করে জড়িয়ে ধরলে। বাজনা মায়ের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললে।

পরেরদিন মা বললে, "বাজনা, আমি কাঠ কুড়ুতে মাঠে যাচ্ছি। তুমি লক্ষ্মী হয়ে ঘরে থেকো।"

মা চলে গেল।

বাজনার মুখে হাসি নেই কাল থেকে। মন ভার-ভার। জানলার গরাদে মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল চুপটি করে। দেখছিল আকাশের দিকে। মেঘ আছে নাকি! যদি বিষ্টি নামে! বিষ্টি-ফোঁটারা আবার যদি চেঁচিয়ে ওঠে, "বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি" বলে!

না, মেঘ নেই। খুশিতে, আলোতে আকাশ আজ উপচে গেছে।

তবু ভাল লাগছে না বাজনার। বালিশে মুখ গুঁজে বিছানায় শুয়ে পড়ল। অন্যদিন ও কি এতক্ষণ ঘরে থাকত? মা বারণ করলে কি হয়েছে! কে শুনছে মায়ের কথা? বাজনা? তবেই হয়েছে! কখন ও ঘর থেকে পালিয়ে মাঠে মাঠে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিত!

"বাজনা!" কে যেন ডাকল তাকে হঠাৎ। একেবারে অচেনা গলা।

চমকে উঠল বাজনা। ফিরে তাকাল। ঘরের মধ্যে কাউকে দেখতে পেলে না তো!

"বাজনা!" আবার ডেকেছে।

কে ডাকছে? কার গলা? এমন অচেনা?

"এই তো, আমি।"

বাজনা অবাক চোখে ঘরের এদিক ওদিক দেখতে লাগল। কেউ তো নেই!

"আমার দিকে চাও, আমি টাটু ডাকছি।"

দৌড়ে গেল বাজনা খেলনা ঘোড়াটার কাছে। কাঠের ঘোড়া। কাল মা কিনে এনেছে।

"মন খারাপ তোমার?" টাট্টু জিজ্ঞেস করলে।

বাজনা বেবাক হয়ে চেয়ে রইল টাট্টুর চোখের দিকে। মুখের দিকে।

টাট্টু এবার ঘাড় নাড়ল। "আমি জানি, কেন তোমার মন ভার।"

"কেন?" ধরা-ধরা গলায় খুব আস্তে জিজ্ঞেস করলে বাজনা।

"বিষ্টি-ফোঁটারা বলে গেছে তোমার নামটা বিচ্ছিরি, তাই।"

চোখের পাতা দুটি কেঁপে উঠল বাজনার।

"অবাক লাগছে?"

তবু অবাক হয়েই চেয়ে রইল বাজনা।

"মা তোমাকে দুষ্টু বলেন, না?"

সঙ্গে সঙ্গে অভিমানে ভার হয়ে গেল বাজনার মুখখানি। উত্তর দিলে, "বলেই তো। আমি তো দুষ্টু।"

"আসলে কিন্তু তুমি একটুও দুষ্টু নও।" বলে হাসল ঘোড়াটা।

"তবে?"

"যত নষ্টের গোড়া তোমার নামটা।"

থমকে চায় বাজনা। জিজ্ঞেস করে, "মানে?"

"মানে তোমার নামটা বিচ্ছিরি।"

চিলের মত চেঁচিয়ে উঠল বাজনা, "না-আ-আ।" রাগে চেপে ধরল ঘোড়াটাকে দু হাত দিয়ে। ঘোড়াও তার নাম নিয়ে ঠাট্টা করছে! ছুড়ে ফেলে দিতে গেল।

ঘোড়াও চেঁচাল, "না, না, ফেল না। শোন, শোন, আমার কথা শোন।"

"কী কথা?" রাগে কাঁপতে-কাঁপতেই জিজ্ঞেস করলে বাজনা।

"বলছি। তুমি এত রাগ করলে বলব কেমন করে?"

"না, আমার নাম নিয়ে সবাই ঠাট্টা করবে, আমি কিছুতেই শুনব না।"

"ঠাট্টা আমি করি নি সত্যি বলছি।" উত্তর দিলে ঘোড়া।

"বেশ, তবে কী বলতে চাও, বল তাড়াতাড়ি।"

"আমি বলছি কী জান, বলছি তোমার দরকার একটা সুন্দর নামের। সুন্দর নাম। লক্ষ্মী নাম।"

"তার মানে?"

"মানে একটা সুন্দর নামে সবাই ডাকছে তোমায়, সবাই আদর করছে, দেখবে তোমার মন কত খুশি। একদম দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে

করছে না। মা যা বলছেন, তুমি শুনছ। রাগ করছ না। আসলে তুমি তো দুষ্টু নও। নামটাই তো তোমাকে দুষ্টুমি করাচ্ছে। কিছুতেই লক্ষ্মী হতে দিচ্ছে না। মা'র কথা শুনতে যে ইচ্ছে করে না তোমার, তা তো নয়। আসলে নামটা এমন বদ, কিছুতেই শুনতে দিচ্ছে না। এক্ষুনি ভুলে যাও নামটা, নতুন নামে সবাই ডাকুক, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। সুন্দর নাম মানেই লক্ষ্মী ছেলে!"

কীরকম নতুন নতুন লাগল কথাগুলো বাজনার কানে। তাই তো, এমন কথা তো কেউ তাকে আগে বলে নি! অমন রাগে থমথমে মুখখানা বাজনার ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ঘোড়াকে ছেড়ে দিল বাজনা। হঠাৎ মাথার মধ্যে ভাবনা ঢুকে গেল। ভাবলে, "ঘোড়া ঠিকই বলেছে। হ্যাঁ, নামটাই সব। নইলে ইচ্ছে থাকলেও মায়ের কথা না শুনে, অন্যের কথা কেন শুনি! মন বলছে লক্ষ্মী হই, কিন্তু তবু দুষ্টুমি করে ফেলি! সেই ভাল, নামটাই পাল্টে ফেলব।"

কিন্তু সুন্দর নাম, নতুন নাম পাবে কোথায় বাজনা? বাজনা ভাবল, ঘোড়া তো একটা নতুন নাম দিতে পারে! তাই বললে, "ও টাট্টু, ও টাট্টু, সেই ভাল, নাম আমি পাল্টাব। তুমি আমায় একটা সুন্দর নাম দাও! নতুন নামে ডাক!"

ঘোড়া তো হেসেই আকুল।

বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "হাসির কথা কী হল আবার?"

ঘোড়া বললে, "হাসির কথাই তো। আমি কেমন করে নাম দেব তোমায়? আমি দিলে তো হবে না। আগে অসুখটাকে তো সারাতে হবে!"

অবাক হল বাজনা। জিজ্ঞেস করলে, "অসুখ? কিসের অসুখ?"

"বারে! নামের অসুখ। তোমাব দেহের মধ্যে একটা নামের অসুখ ঢুকে গেছে। সেই অসুখটাকে শরীর থেকে দূর না করতে

পারলে তুমি তোমার বাজনা নামটা ভুলবে কেমন করে? নামের অসুখটা শরীর থেকে দূর করে, বাজনা নামটা একেবারে মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। তবেই নতুন নাম। নইলে নতুন যে-নামেই ডাকা হোক, বার বার বাজনা নামটাই মনে পড়ে যাবে!"

ঘোড়ার কথা শুনে বাজনার মুখ শুকিয়ে গেল। বললে, "তাই বুঝি! তা হলে তো মুশকিল!"

"ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। তুমি যদি আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাও তো সব ঠিক হয়ে যাবে।"

অবাক হয়ে ঘোড়াকে জিজ্ঞেস করলে বাজনা, "তোমার সঙ্গে? কোথায়?"

"বদ্যির কাছে।"

"বদ্যি!"

"হুঁ, হুঁ, এমন বদ্যিকে আমি চিনি যে তোমার নামের অসুখ এক মিনিটে সারিয়ে দিতে পারে।"

খুশি হয়ে উঠল বাজনার চোখ দুটি। জিজ্ঞেস করলে, "বদ্যি কতদূরে থাকে?"

ঘোড়া বললে, "তা একটু দূরে।"

"কতক্ষণ লাগবে?"

"যতক্ষণ যেতে।"

"মা আসতে আসতে যদি না ফিরতে পারি, মা যে রাগ করবে!"

"তা তো করবেনই।"

"মা বকবে যে তা হলে।"

"হ্যাঁ, তাও বকবেন। কিন্তু তোমার বিচ্ছিরি নামটা তো তাতে দূর হবে না।"

"হ্যাঁ, তাও ঠিক।" একটু ভাবল বাজনা। তারপর বললে, "সেই ভাল। তাই চল সেই বদ্যির কাছে।"

বাজনা জামা গায়ে দিলে। কাপড় পরলে। টাট্টুকে হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বাজনা ঘরের বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলে, "টাট্টু, টাট্টু, কোন রাস্তায় যাব?"

টাট্টু বললে, "এই রাস্তা সিধে চল।"

বাজনা হাঁটা দিলে।

টাট্টু বললে, "পা চালিয়ে হাঁটো। কেউ না দেখে ফেলে।"

"দেখে ফেললে?" হাঁটতে হাঁটতে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে বাজনা।

"কাউকে কিছু বলবে না।"

বলতে-বলতেই সেই গাবদাগাবুস ব্যাঙটা দেখে ফেলেছে। এই রে!

ব্যাঙ ডাকলে ঘ্যাঙ-ঘ্যাঙ, "ও বাজনা, বাজনা, কোথা যাচ্ছ?"

বাজনা চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

ব্যাঙ বললে, "ও বাজনা, চুপ কেন? হাতে তোমার কী ওটা?"

বাজনা চট করে ঘোড়ার মুখের দিকে চাইল আড়চোখে। ঘোড়া চোখ টিপলে। বাজনা বললে, "আমার হাতে কাঠের ঘোড়া। খেলতে যাচ্ছি।"

ব্যাঙ জিজ্ঞেস করলে, "আমি তোমার সঙ্গে যাব। খেলতে নেবে?"

"না। তুমি না বলেছ আমার নাম বিচ্ছিরি।"

হেসে উঠল ব্যাঙ ঘ্যাঙ-ঘ্যাঙ করে। হাসতে হাসতে থুপ থুপ করে নাচতে লাগল, "বিচ্ছিরি! বিচ্ছিরি!"

রাগে মুখখানা লাল হয়ে গেল বাজনার। ঝট করে একটা ইঁট তুলে নিল। ছুড়ে দিল।

থপ করে সরে গেল ব্যাঙটা। লাফিয়ে লাফিয়ে ব্যাঙ ডাকলে, "বিচ্ছিরি! বিচ্ছিরি!" ডাকতে ডাকতে বাজনার পিছু তাড়া লাগিয়ে দিলে। বাজনা তীরের মত ছুটতে লাগল।

যখন আর ব্যাঙের ডাক শোনা গেল না, তখন বাজনা পেছন ফিরে দেখলে। দেখলে ব্যাঙও নেই, কেউ-ই নেই। তারপর সামনে তাকালে। চমকে উঠল।

টাটু জিজ্ঞেস করলে, "চমকাও কেন?"

"সামনে নদী।" চেঁচিয়ে উঠল বাজনা। "সরু নদী তিরতির।"

"নদীর ওপর?" জিজ্ঞেস করল টাটু।

"বাঁশের সাঁকো।"

"চল যাই নদীর ওপার। পারবে না সাঁকোর ওপর দিয়ে যেতে?" টাটু জিজ্ঞেস করলে।

বাজনা বললে, "হ্যাঁ পারব।" বলে সাঁকো হেঁটে নদী পার হল।

নদী পেরিয়েই বাজনা থ। দেখতে লাগল অবাক হয়ে। অচেনা-অচেনা রাস্তাটা! অজানা-অজানা জায়গাটা!

বাজনা বললে, "ও টাটু, ও টাটু, গাছ আছে পাখি নেই, দেখেছ?"

"তাই বুঝি!"

"ফুল আছে রঙ নেই দেখেছ?"

"নেই বুঝি!"

"মাঠ আছে ঘাট নেই দেখেছ?"

"এই বুঝি!"

বাজনা বললে, "কী বুঝি?"

টাটু বললে, "এই বুঝি বদ্যির দেশ।"

"এইটা বদ্যির দেশ?" খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করল বাজনার। জিজ্ঞেস করলে, "কোনদিকে বদ্যির বাড়ি?"

টাট্টু বললে, "এইবারেই মুশকিল।"

"কেন? মুশকিল কেন?" জিজ্ঞেস করলে বাজনা।

"আমি তো বাড়িটা ঠিক চিনি না। চল এগিয়ে যাই।"

বাজনা বললে, "তাই চল। যখন এসে পড়েছি, তখন ঠিক খুঁজে বার করব।"

একটু যেতেই বাজনা একটা বুড়িকে দেখতে পেলে। বুড়িটা ঘরের দাওয়ায় বসে আছে। সামনে উঠোন। উঠোন ভর্তি ধান ছড়ান। রোদ পড়েছে। ধান শুকুচ্ছে। বুড়ির হাতে ঠেঙা। ঠেঙা ঠুকছে। পাখি তাড়াচ্ছে।

বাজনা টাট্টুকে বললে, "টাট্টু, টাট্টু, বুড়িকে বদ্যির কথা জিজ্ঞেস করব!"

টাট্টু বললে, "কর।"

বাজনা বুড়ির কাছে এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে, "ও বুড়ি, ও বুড়ি, বদ্যির বাড়ি কোনদিকে গো জান? খুঁজে পাচ্ছি না।"

বুড়ি আড়চোখে চাইল বাজনার দিকে। বাজনা বুঝলে না বুড়ির চাউনি বাঁকা-বাঁকা! বুড়ি বাঁকা চোখে বললে, "জানি বইকি!"

বাজনার মুখখানা খুশিতে হেসে উঠল, "জান? কোনদিকে?"

"দিক-টিক কেউ জানে না।" বুড়ি ড্যাবড়া-ড্যাবড়া চোখ দুটো এত্তো বড় বড় করে বললে, "সে ভয়ানক রাস্তা। শুধু ঘোর-প্যাঁচ। প্যাঁচ আর প্যাঁচ। সিধে রাস্তা যাবে, পাবে না। বেঁকা রাস্তায় হাঁটো, পাবে না। ঘুর রাস্তায় ছোট, সিধে রাস্তায় পড়বে। সিধে রাস্তায় পড়লেই, ঘুর রাস্তায় ছুটবে। মানে এই আছে, এই নাই। হাত বাড়ালে পাই না।"

বাজনার মাথা গুলিয়ে গেল। ভ্যাবলার মত বললে, "এমন রাস্তা তো কখনও দেখি নি।"

বুড়ি বললে, "দেখার তো সবে সুরু হয়েছে। বয়েস হোক, তখন দেখতে দেখতে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।" বলে বুড়ি মুচকি মুচকি হাসলে।

"তো তুমি আমায় একটু পথটা দেখিয়ে দাও না।"

"ওরে ছেলে! পথ দেখাব মাগনা-মাগনা!"

"তবে?"

"এ দুনিয়ায় মাগনায় কে কাজ করে র‍্যা? কী দরকার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে!"

বাজনা বললে, "বুড়ি, বুড়ি, আমার কাছে তো একটি কানা-কড়িও নেই যে তোমায় দেব।"

"কড়ি নেই তো কী হয়েছে! কাজ করার গতর তো আছে!"

"তা আছে।"

"তবে আমার কাজ করে দে।"

বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "কী কাজ?"

বুড়ি বললে, "ঘুঘু খেদানো।"

বাজনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "সেটা আবার কী কাজ?"

"এই যে আমি বসে বসে যা করছি। ঘুঘু এসে ধান খাচ্ছে, তাড়াচ্ছি।" বলে বুড়ি ঠেঙাটা তুলে ঠুকলে দুবার। দুটো পাখি উড়ে গেল।

বাজনা হাঁপ ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ও-ও! এই কাজ! এ তো সহজ কাজ! এ আমি খুব করতে পারি। আমি বলে একাজ কত করেছি।"

"পার তো বসে পড়। আমি একটু জিরিয়ে নিই। বসে বসে কোমর কনকন করছে।"

বাজনা বললে, "এক্ষুনি বসি কেমন করে? আগে তুমি বদ্যির বাড়িটা দেখিয়ে দাও। আগে বদ্যির সঙ্গে দেখা করে আসি, তারপর তোমার কাজ করে দেব।"

"ওরে ছেলে!" বলে বুড়িটা কেমন সন্দেহে চোখ বেঁকাল। "উঁহুঁ! সেটি হচ্ছে না বাছা! ঐ বলে নিজের কাজ সেরে পালাবার ধান্ধা! আগে আমার কাজ, তারপর বদ্যির খোঁজ।"

বাজনা বুঝতে পেরেছে বুড়ি তার কথা শুনবে না। তাই বুড়িকে আড়াল করে লুকিয়ে লুকিয়ে টাট্টুর চোখের দিকে চাইল। টাট্টু ইসারা করলে। বাজনা বুঝল টাট্টু রাজী।

সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বললে, "আচ্ছা বেশ, তাই করছি। তো কতক্ষণ করতে হবে?"

বুড়ি বললে, "সাঁঝের বাতি জ্বলবে, পাখি ঘরে চলবে, তারপর ছুটি।"

"বাবা সে যে অনেকক্ষণ!"

বুড়ি ধমকে উঠল, "অনেকক্ষণই তো। আজকালকার ছেলেদের ঐটাই তো দোষ। খাটব না, কষ্ট করব না, অমনি অমনি সব দুঃখু ঘুচে যাবে। কেষ্ট পেতে গেলে কষ্ট করতে হয়।"

বাজনা বললে, "কষ্ট আমি খুব করতে পারি।"

"তো কর।"

"তারপর বলে দেবে তো বদ্যির বাড়িটা?"

বুড়ি কেমন খ্যান-খ্যান করে হেসে উঠল। বললে, "বলে কী, একেবারে বদ্যির ঘরে পেঁছে দেব। তবে দেখো বাছা, যেন একটিও ধান পাখির পেটে না যায়! তা হলে বলা দূরে থাক, গলা যাবে। আমায় চেন না।"

বাজনা বললে, "না, না, একটি কুটোও তোমার নষ্ট হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে জিরুতে পার। একাজে আমার খুব অভ্যেস আছে।"

"বেশ, তবে আমি একটু গড়িয়ে নিই," বলে বুড়ি উঠে, দোর ঠেলে ঘরে ঢুকল। আর বাজনা বুড়ির লাঠি হাতে নিয়ে ঘুঘু তাড়াতে লেগে পড়ল।

উঠোন কী আর একটুখানি যে এক কোণে বসে বসে কাজ হবে! এদিক উঠোন, ওদিক উঠোন, মস্ত উঠোন। উঠোন ভর্তি ধান বিছানো। ঘুঘুগুলোর তো মজা! দেখেছে বুড়ি নেই, একটা পুঁচকে ছেলের হাতে লাঠি। তাই ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উঠোনে নেমে ধান খুঁটতে সুরু করে দিলে। বাজনাও লাঠি নিয়ে তেড়ে যায়। গেলে কী হবে! পাখিগুলোও উঠোনের আর একদিকে উড়ে যায়! আবার যেই বাজনা ওদিকে যায়, পাখিগুলোও এদিকে উড়ে আসে। আচ্ছা ফ্যাঁসাদ তো! বাজনা খানিকটা ছুটে, খানিকটা হেঁটে, খানিকটা নেচে ঘুঘুর পেছনে লেগে রইল।

কতক্ষণ আর লাগবে! মানুষের শরীর তো! এতখানি পথ এসেছে হাঁটতে হাঁটতে। ক্লান্ত তো হবেই। তাই বাজনা বললে, "টাট্টু, টাট্টু, পা ব্যথা করছে।"

টাট্টু বললে, "পায়ের আর দোষ কী!"

বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "কী করি?"

"বসে পড়। বসে বসে লাঠি ঠোক।"

বাজনা বললে, "সেই ভাল। বসে বসেই লাঠি ঠুকি। পাখি তাড়াই।" বলে দাওয়ায় বসে পড়ল।

বসতে হল না বেশিক্ষণ। ছুটোছুটি করছিল সে তবু ছিল ভাল। যেই বসেছে, অমনি হাই উঠতে লাগল বাজনার। ঢুল লাগছে। চোখ জুড়িয়ে ঘুম আসছে। থাকতে পারল না। বাজনা দাওয়ার খুঁটিতে মাথা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কাঠের টাট্টু হাত থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ল। টাট্টু চেঁচিয়ে উঠল। শুনতেই পেলে না বাজনা।

ঘরের ভেতর দোর ভেজিয়ে বুড়ি ঘুমুচ্ছে নাক ডাকিয়ে। আর দাওয়ায় বসে, খুঁটিতে হেলান দিয়ে বাজনা ঘুমুচ্ছে চোখ বুজিয়ে!

আর বলতে! তাই না দেখে শ'য়ে শ'য়ে ঘুঘু উঠোনে নেমে এল। ধান খুঁটতে আরম্ভ করে দিলে।

অর্ধেক ধান যখন পাখির পেটে, তখন বুড়ির ঘুম ভেঙেছে। ঘরের দোর ঠেলে বাইরে বেরিয়েছে। বেরিয়েই বুড়ির চক্ষু ছানা-বড়া! একেবারে চিলের মত চেঁচিয়ে উঠল বুড়ি, "ওরে আমার সব্বনাশ হয়ে গেল রে, সব্বনাশ হয়ে গেল!"

চেঁচামেচিতে চমকে উঠেছে বাজনা। আর ঘুম! চোখ চেয়েই বাজনা থ। "এই যাঃ!" বলে লাফিয়ে উঠল। "হুস-হাস" করে তেড়ে

গেল পাখিগুলোর দিকে। অগুনতি পাখি তাড়া খেয়ে আকাশে ওড়া দিলে। উড়তে উড়তে পগারপার। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল বাজনা আকাশের দিকে।

চেয়ে থাকবে কী! বুড়ি চিলের মত চেঁচাতে-চেঁচাতেই তেড়ে এল বাজনার দিকে। বাজনা ধাঁ করে টাট্টুকে মাটি থেকে তুলে নিল। চটপট টাট্টুর দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "সব্বনাশ! কী হবে?"

টাট্টু বললে, "পালাও।"

বাজনাও চক্ষের নিমেষে ভোঁ-কাট্টা!

বুড়ি তো আর ছুটতে পারে না। তাই ধরতেও পারল না। ঐখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই হাত-পা ছুড়তে লাগল। চেঁচাতে লাগল।

বাজনা আর পেছন ফিরে দেখে! রামোচন্দর! ছুট-ছুট-ছুট।

তারপর?

বুড়ির বাড়ি যখন আর দেখা গেল না, বুড়ির গলাও আর শোনা গেল না, তখন বাজনা রাস্তা ছাড়িয়ে মাঠে পড়ল।

মাঠে ছাগল চরছে।

টাট্টু ডাকলে, "বাজনা, বাজনা, থেমে পড়।"

বাজনা ছুটতে-ছুটতেই জিজ্ঞেস করলে, "কেন?"

টাট্টু বললে, "আর ভয় নেই।"

বাজনা দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপাচ্ছে। বললে, "বাবা! বাঁচা গেল! আর একটু হলেই বুড়ির লাঠি পিঠে পড়ত। কিন্তু ঘুমেরও কী সময়-অসময় নেই? এমন বেআক্কেলে! সব মাটি! বদ্যির বাড়ি কোন-দিকে এখন কে বলে দেবে! ছিঃ! ছিঃ!"

টাট্টু বললে, "বাজনা, দেখো, দেখো।"

বাজনা বললে, "কী? কী?"

টাট্টু বললে, "মাঠে কী দেখছ?"

বাজনা বললে, "ছাগল দেখছি একপাল।"

"আর কী দেখছ?"

"লাঠি হাতে বুড়ো দেখছি। তোবড়া গাল।"

"ওকে জিজ্ঞেস কর।"

"জিজ্ঞেস করব? কিছু আবার বলবে না তো!"

"কী বলবে?"

"তবে জিজ্ঞেস করি।" বলে বাজনা বুড়োর কাছে এগিয়ে গেল। একটু দূরে দাঁড়ানোই ভাল। হাতে আবার লাঠি। সকলের মতি-গতি তো সব সময়ে বোঝা যায় না! তাই দূর থেকে দাঁড়িয়েই বাজনা ডাকলে, "ও বুড়ো, ও বুড়ো।"

বুড়ো বাজনার দিকে চেয়ে ফোকলা দাঁতে হাঁকলে, "কী ছেলে? কী ছেলে?"

"বদ্যির বাড়িটা কোনদিকে গো?"

"হোই দিকে।"

"একটু দেখিয়ে দেবে?"

"এখন সময় নেই। এখন কাজের সময়।"

"কখন সময় হবে?"

"যখন কাজ শেষ হবে।"

"কখন কাজ শেষ হবে?"

"যখন সময় হবে।"

বাজনা বুড়োর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। মনটা কেমন চুপসে গেল। বললে, "বাবা, এযে বড় গোলমেলে ব্যাপার!"

বুড়ো ঘাড় ফিরিয়ে বললে, "গোলমেলেই তো!"

তবু বাজনা হাল ছাড়ল না। জিজ্ঞেস করলে, "কাজ শেষ হলে দেখিয়ে দেবে তো?"

বুড়ো দপ করে রেগে উঠেছে। বললে, "বদ্যির বাড়ি কী হেথা, যে গেলুম আর এলুম! ও বাছা আমি পারব না। বুড়ো মানুষ, কাজ সেরে ঘরে যাব। ঘরে শুয়ে তামুক খাব। শরীরটাকে জিরন দেব। সারাদিন খাটলে কষ্ট হয় না?"

বাজনা তবু ছাড়বার পাত্র নয়। বললে, "ও বুড়ো, ও বুড়ো, না, না, তোমায় কষ্ট দেব না। তার চেয়ে এক কাজ কর না?"

বুড়ো জিজ্ঞেস করলে, "কী কাজ?"

বাজনা এগিয়ে গেল বুড়োর কাছে। বললে, "ঐ গাছের নিচে ছায়া দেখছ?"

বুড়ো বললে, "ছায়া দেখছি।"

"ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া পাচ্ছ?"

বুড়ো বললে, "হাওয়া পাচ্ছি।"

"ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়ায়, ঐ গাছের নিচে ছায়ায় তুমি শুয়ে পড়। শুয়ে শুয়ে তামুক খাও। আমি বরঞ্চ তোমার ছাগল চরাই।"

বাজনার কথা শুনে বুড়োর অমন দপ করে জ্বলে ওঠা রাগটা যেন ফস করে নিভে গেল। বুড়োর মুখে হাসি ফুটল। ভাবলে ছেলেটা ভাল। বললে, "তুই কি পারবি?"

বাজনা ঘাড় নাড়লে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব পারব।"

"শেয়াল আছে এদিক-উদিক। ছাগল নিয়ে পালায় যদি!"

"শেয়াল আছে তো বয়ে গেছে। আমার হাতে লাঠি আছে।" বলে বুড়োর হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল বাজনা।

খুশি মনে বুড়ো জিজ্ঞেস করলে, "ঠিক পারবি তো?"

"হুঁ, হুঁ, খুব পারব," বলে বাজনা এতখানি ঘাড় বেঁকালে।

"তবে আমি একটু গড়িয়ে নিই।" বুড়ো গাছের নিচে শুতে গেল। বললে, "বেলা পড়লে, ঘুম ভাঙলে বদ্যির বাড়ি পেঁছে দেবখন।"

বাজনার মুখখানি হাসি-হাসি।

বুড়ো গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল।

বাজনা লাঠি নিয়ে মাঠে নামল।

বুড়ো তামুক খেয়ে একটু পরে নাক ডাকাল।

বাজনা চুপিসাড়ে ঘোড়ার মুখ তাকাল।

টাট্টু জিজ্ঞেস করলে, "কী?"

বাজনা মুখটা কাঁচুমাচু করে বললে, "খিদে।"

টাট্টু বললে, "ঐতো গাছ। দেখছ না ফল!"

বাজনা বললে, "কই?" এগিয়ে গেল গাছটার দিকে। গাছের দিকে তাকিয়ে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল বাজনা। চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যাঁ-তো-রে! ও টাট্টু, ও টাট্টু, আম।"

টাট্টু বললে, "তাই নাকি! উঠে পড় গাছে।"

"কেউ বকবে না তো!"

"কাছে-পিঠে তো কাউকে দেখছি না।"

"তবে উঠে পড়ি", বলে বাজনা একবার পেছন ফিরে দেখে নিলে। না, ছাগলগুলো ঘাস চিবুচ্ছে। বুড়োটাও ঘুম দিচ্ছে। টাট্টুর দিকে চেয়ে বললে, "তোমায় নিয়ে গাছে উঠি কেমন করে?"

টাট্টু বললে, "আমি নিচে থাকি।"

"সেই ভাল।" বলে বাজনা টাট্টুকে গাছের নিচে রাখলে। রেখে চটপট গাছে উঠে পড়ল।

উরি বাবা! কত বড় বড় আম! পেকে টুসটুস করছে। ঝট করে একটা ছিঁড়ে নিল ডাল থেকে। খেতে আরম্ভ করে দিল। কী মিষ্টি!

গাছের ওপর থেকেই চাপা গলায় বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "ও টাট্টু, ও টাট্টু, খুব মিষ্টি! খাবে?"

টাট্টু উত্তর দিলে, "আমি খেলনা ঘোড়া। খেতে জানি না।"

"ও, তাও তো বটে! তবে তুমি বসে বসে দেখ," বলে বাজনা এডাল থেকে ওডালে লাফ দিলে। মজাসে আম খেতে লাগল।

"ব্যা-এ্যা-এ্যা-এ্যা।" হঠাৎ একটা ছাগলছানা মরাকান্না কেঁদে চেঁচিয়ে উঠল যেন!

চমকে ওঠে বাজনা। ছাগলছানা চেঁচায় কেন? গাছের ওপর থেকেই উঁকি মারল বাজনা। ওঃ! যা-বলা ঠিক তাই। একটা শেয়াল! চক্ষুস্থির বাজনার! ছাগলছানার টুঁটি ধরে শেয়ালটা ছুটছে। ছানাটা চেঁচাচ্ছে। ধাড়িগুলো পালাচ্ছে। গাছের ওপর থেকেই আচমকা চেঁচিয়ে উঠেছে বাজনা, "শেয়াল, শেয়াল।"

আর দেখতে হয়! বুড়োর ঘুম গেছে চমকে। ধড়ফড়িয়ে লাফিয়ে উঠেছে। বাজনাও গাছ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ঝট করে টাট্টুকে গাছের নিচ থেকে তুলে নিয়ে শেয়ালের পিছু তাড়া লাগালে। চেঁচালে, "শেয়াল, শেয়াল!"

বুড়োও লাফিয়ে উঠে দৌড় মারল। চেঁচিয়ে হাঁকল, "আমার ছাগল, আমার ছাগল।"

বাজনা ছোটে। বাজনা চেঁচায়, "শেয়াল, শেয়াল।"

শেয়াল ছোটে, বাঁই বাঁই।

বুড়ো ছোটে। বুড়ো চেঁচায়, "ছাগল, ছাগল।"

ছাগল ডাকে, "ব্যা-ব্যা।"

বুড়োটা ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে বসে পড়ল।

শেয়ালটা ছুটতে ছুটতে টুপ করে লুকিয়ে পড়ল।

ছাগলটা মুখে নিয়ে শেয়ালটা কোথা লুকাল? এ-বাড়িতে? না ও-বাড়িটায়? বাঁ গলিতে? না ডান-রাস্তায়? ঠিক ঠাওর করতে পারল না বাজনা। বাজনার মনে হল যেন শেয়ালটা সামনের বাড়িটাতেই টপকেছে। তাই ছুটতে ছুটতে এসে সামনে বাড়ির দরজা ঠেললে বাজনা, "কে আছ? দরজা খোল, দরজা খোল। শেয়াল!"

দু-চারবার ঠেলতেই, দু-একবার হাঁকতেই দরজা খুলে গেল।

একটা লোক দরজা খুলে সামনে দাঁড়িয়ে। লোকটা গেঁড়া, চোখটা ট্যারা, মুণ্ডু নেড়া! বাজনাকে দেখে বললে, "কী চাই?"

বাজনা হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচালে, "শেয়াল ঢুকেছে, শেয়াল!"

লোকটা ধমকে উঠল, "সে আবার কী? এখানে কেন শেয়াল ঢুকবে?"

বাজনা তবু বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা শেয়াল ছাগল চুরি করে এ বাড়িতেই ঢুকেছে।"

লোকটা এবার ভীষণ ক্ষেপে উঠল। হেঁকে বলল, "এটা শেয়ালদা নয়, এটা বদ্যিবাটি।"

বদ্যির নাম শুনে বাজনার বুকটা ছ্যাঁৎ করে চমকে উঠল। বদ্যি! এটা বদ্যি বাটি! এতক্ষণ ধরে সে যে বদ্যির বাটিই খুঁজছিল! কত কষ্ট! আনমনে বলেই ফেলল, "বদ্যি!" ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল বাজনার।

"হুঁ হুঁ, বদ্যি। আমাদের বড়বাবু।" লোকটা নেড়া-মাথা নেড়ে নেড়ে বললে।

মুখখানা ঝলসে গেল বাজনার খুশিতে। বললে, "আজ্ঞে আমি তো তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে চাই।"

"কেন? কার বিয়ে?" গেঁড়া লোকটা, ট্যারা চোখটা বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

বাজনা যেন আকাশ থেকে পড়ল। "বিয়ে! না, না, বিয়ে নয়!"

"তবে?"

"আজ্ঞে অসুখ। আমার।"

লোকটা এবার তেড়েমেড়ে রেগে উঠল, "কোথাকার ছেলেরে তুই? বড়বাবু রোগী দেখা ছেড়ে দিয়েছেন কবে, জানিস না?"

"মানে!" মুখ শুকিয়ে গেল বাজনার।

"মানে বিয়ে।" লোকটা যাচ্ছেতাই মুখ করে খেঁকিয়ে উঠল, "এখন বিয়ের পদ্য লেখেন বড়বাবু।" বলে সেই গেঁড়া-নেড়া-ট্যারা লোকটা দুম করে দরজা বন্ধ করে দিল। একেবারে বাজনার নাকের ওপর। বাজনা চমকে উঠল।

বাজনা বললে, "টাট্টু, টাট্টু, সব গেল।"

টাট্টু বললে, "না, না, কিচ্ছু যায় নি। তাড়াতাড়ি একটা উপায় বার কর। বদ্যির সঙ্গে দেখা করতেই হবে।"

"কী উপায়?"

"যা হোক। এখানে দাঁড়ান ঠিক নয়। তাড়াতাড়ি ভাব।"

ভাবতে লাগল বাজনা।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল বাজনা, "টাট্টু, টাট্টু, হয়েছে।"

টাট্টু বললে, "কী?"

"বলছি," বলে আবার দরজায় ঠেলা দিলে। ডাক দিলে, "ও মশাই, ও মশাই, দরজা খুলুন।"

"কে? কে?" তিরিক্ষি মেজাজে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, "আবার বিরক্ত করছিস।" দরজা খুলে গেল। বাজনাকে দেখে তেড়ে এল, "কী? কী?"

বাজনা বললে, "আজ্ঞে বিয়ে। বিয়ের পদ্যের জন্যেই এসেছি।"

"সে কী! এই বললি অসুখ?"

"আজ্ঞে অসুখ তো আমার নিজের। বিয়ে তো আমার ঘোড়ার।"

"কার বিয়ে?" শুনেও যেন লোকটা নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"আজ্ঞে ঘোড়ার।" বলে বাজনা নিজের হাতটা লোকটার চোখের সামনে ধরলে।

লোকটা বাজনার হাতের ঘোড়াটা ট্যারা চোখে দেখতে দেখতে অবাক হয়ে বললে, "ঘোড়ার বিয়ে!"

বাজনা উত্তর দিলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

লোকটার মেজাজটা হঠাৎ যেন নরম হয়ে গেল। বললে, "রসো, রসো। ঘোড়ার বিয়ের পদ্য বড়বাবু লেখেন কিনা আমার তো জানা নেই। একটু দাঁড়াও, আমি চট করে জিজ্ঞেস করে আসি।"

লোকটা ভেতরে ঢুকে গেল।

বাজনা আর কথা বললে না। টাট্টুর চোখের দিকে চেয়ে দেখলে। টাট্টু চোখ টিপে হাসল।

একটু পরেই লোকটা আবার হাজির। বললে, "বড়বাবু ডাকছেন।"

"কে ডাকছেন?"

"বড়বাবু। মানে বদ্যিমশাই।"

"ডাকছেন!" যেন হাতে চাঁদ পেল বাজনা। আর তর সইল না। এক লাফে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল দরজা ডিঙিয়ে। লোকটার পিছু পিছু হাঁটা দিলে।

যা ভেবেছিল তা তো নয়। বাবা! বাড়ির ভেতরটা কী সাংঘাতিক। অন্ধকার। তেমনি নিচু সুড়ঙ্গের মত। মাথা উঁচু করে গেছ কী ঠক! অবিশ্যি বাজনার ভয় নেই। ওতো এমনিতেই ছোট্ট। তবু লোকটা বললে, "সাবধান, মাথা না ঠুকে যায়!" বাজনাও মাথা নিচু করেই হাঁটল।

বেশিক্ষণ হাঁটতে হল না। ক' পা যেতেই অন্ধকার কেটে গেল। তকতকে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। বললে, "চল, এই ঘরে বড়বাবু আছেন।" ঢুকে গেল সেই গেঁড়া-নেড়া ট্যারা লোকটা ঘরের ভেতর।

প্রথমটা বাজনা অবশ্য একটু দোনোমনো করেছিল। কিন্তু লোকটা বললে, "আরে ভয় নেই, ভয় নেই। চলে এস।"

সত্যি সত্যি বদ্যির ঘরে ঢুকে পড়ল বাজনা।

বাসরে বাস! কোথায় বদ্যি! একটা গরু! গরুটা কাপড় পরেছে কাঁচি-পাড়। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, গিলে করা। ছোট্ট একটা লেখন-চৌকি। তাতে কাগজ, কলম, কালি সাজানো। তার সামনে আগডুম-বাগডুম হয়ে বসে। চোখ দুটো কড়িকাঠের দিকে। চোখের পলক পড়ে না। কিন্তু বাজনা দেখল কাচার ফাঁক দিয়ে ল্যাজটি ঠিক নড়ে নড়ে উঠছে। বাজনার তো চক্ষুস্থির!

লোকটা বাজনাকে ইসারা করে বললে, "ইনিই বড়বাবু।"

বাজনা লোকটার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলে, "ইনিই বদ্যি?"

লোকটা ঘাড় নাড়লে, "হ্যাঁ, বড়বাবু বিয়ের পদ্য লিখছেন। গড় কর।"

এ্যাঁ! গরুকে গড় করতে হবে! বাজনার মনটা সিঁটিয়ে উঠল। এও ভাগ্যে ছিল! তারপর ভাবল, গরজ তো তারই। তাই চুপচাপ মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে গড় করল। গড় করে আবার উঠে দাঁড়াল।

ওমা! কোথাও কিচ্ছু নেই, হঠাৎ গরু-গরু বদ্যিমশাই গম্ভীর গলায় হুকুম করলে, "বস।" কিন্তু বাজনার দিকে চেয়েও দেখলে না।

সামনে একটা আসন ছিলই। বাজনা নিঃসাড়ে আসনটার ওপর বসে পড়ল। বেবাক হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল বদ্যিমশাই-এর দিকে। একদম চুপচাপ। নেড়া লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ আবার হাম্বা-হাম্বা গলায় বড়বাবু জিজ্ঞেস করলে, "কী নাম?"

বাজনা ধরা-ধরা গলায় উত্তর দিলে, "বাজনা।"

"হো-হো-হো," কী বিচ্ছিরি চাপা গলায় আচমকা হেসে উঠল বদ্যিমশাই! যেমন আচমকায় হাসল, তেমনি আবার চট করে গম্ভীরও হয়ে গেল। কিন্তু বাজনার স্পষ্ট মনে হল হাসিটা যেন

সারা ঘরে ঘুরপাক খাচ্ছে, হো-হো-হো। কান দুটো লাল হয়ে উঠল বাজনার। ছিঃ! ছিঃ! তার নাম শুনে বদ্যিমশাইও হেসে উঠল! যতই হোক গরু তো!

আবার চুপচাপ।

হঠাৎ আবার গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলে বদ্যিমশাই, "কার বিয়ে?"

"আজ্ঞে, আজ্ঞে," বাজনা আমতা আমতা করে ঢোঁক গিলতে লাগল।

আরও একটু চড়া গলায় বদ্যি জিজ্ঞেস করলে, "কার বিয়ে?"

বাজনা চমকে উঠল। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললে, "আজ্ঞে বিয়ে নয়, অসুখ।"

"অসুখ!" বদ্যিমশাই হঠাৎ বাজনার মুখের দিকে তাকাল কট-মট করে। বাজনার বুক শুকিয়ে গেল।

বাজনা কোনরকমে উত্তর দিলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, অসুখ, আমার।"

গরু-গরু বদ্যি এবার রেগে-রেগে বললে, "তবে যে শুনলুম ঘোড়ার বিয়ে। পদ্য লিখে দিতে হবে। রোগীর চিকিচ্ছা এখানে হয় না। শুধুমুধু বিরক্ত করতে এসেছিস কেন? যা এখান থেকে।" ধমক দিয়ে উঠল বদ্যিমশাই।

বাজনা কিন্তু আসন ছাড়ল না। হাতজোড় করে কাকুতি মিনতি করে বললে, "আজ্ঞে, আমি অনেকদূর থেকে আসছি। আমায় দয়া করতেই হবে।"

"যাঃ চ্চলে! রোগের চিকিচ্ছাই ছেড়ে দিয়েছি। বলে দয়া করতে হবে। দয়া-টয়া এখানে হবে না। রাস্তা দেখ। কাজ করতে দে আমায়। বিরক্ত করিস না।"

"আজ্ঞে, আমার অসুখের কথাটা আগে শুনুন, তারপর যা বলার বলবেন।"

"অসুখের কথা আমি শুনব না।" যেন তেড়েমেড়ে উঠল বদ্যি-বড়বাবু। "অসুখের কথা শোনবার আমার সময় নেই। হাতির গল্প বল, শুনতে পারি। বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে বল, করতে পারি। কড়াই-এর ডাল মেখে আলু-পোস্ত দিয়ে ভাত খেতে বল, আমি খেতে পারি। কিন্তু অসুখ, কিম্বা রোগ বা ব্যামো এসব কথা শুনতে রাজী নই।" বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল বদ্যিমশাই।

বাজনার কান্না পেয়ে গেল। ও আর বসে থাকতে পারল না। ঝাঁপিয়ে গিয়ে বড়বাবুর পা দুটো জাপ্টে ধরল। ধরেই হাউ-হাউ করে কান্না জুড়ে দিল, "আজ্ঞে আপনি আমাকে বাঁচান। আমার অসুখ সারিয়ে দিন।"

"আরে ছাড়, ছাড়।" বদ্যিমশাই ব্যস্ত হয়ে পা টানামানি লাগিয়ে দিলে। বাজনাও আরও জোরে জোরে জাপ্টে ধরলে পা দুটো, "না আমি ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না। আগে আমাকে বাঁচান।" আরও জোরে কেঁদে উঠল।

বদ্যিমশাই এবার একেবারে গলে জল। বললে, "কাঁদিস না, কাঁদিস না বাবা! কান্না-টান্না আমি সহ্য করতে পারি না। যখন বদ্যিগিরি করতুম তখন একরকম ছিলুম। মনটা এত নরম ছিল না। কিন্তু যেদিন থেকে বিয়ের পদ্য লিখতে সুরু করেছি, সেদিন থেকে মনটাও আমার বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে। ছেড়ে দে বাবা, পায়ে হাত দিস না।"

বদ্যির গলায় নরম সুর শুনে বাজনা বদ্যির পা দুটো ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

"চুপ কর, চুপ কর।" বাজনাকে আদর করল বদ্যিমশাই। "নারকেল নাড়ু খাবি?" আহা! বদ্যির গলায় যেন আদর উপচে পড়ছে।

বাজনা মাথা নাড়লে, "না, নাড়ু খাব না।"

"জিলিপি খাবি?"

"না, চাই না জিলিপি।"

"তবে? তবে কী খাবি? সেদ্ধ পিঠে?"

"আমি কিচ্ছু খাব না। আপনি আমার অসুখ সারিয়ে দিন। আর আমার কিচ্ছু চাই না।"

বদ্যিমশাই বললে, "দেখ, তোর অসুখ সারিয়ে দিতে তো আমার আপত্তি কিছু নেই। কিন্তু বিদ্যেটা ভুলে গেলে কী করি বল! হ্যাঁ, ছিল, এক সময়ে আমার খুব নাম-ডাক ছিল। আমি কত বড় বড় অসুখ টুসকি মেরে ভাল করে দিয়েছি। কিন্তু যেদিন থেকে আমার চশমাটা হারাল, সেদিন থেকে আমারও সব গেল।"

বদ্যিমশাই-এর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বাজনা। ভাবলে, চশমা আবার কী!

বাজনার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছে বদ্যিমশাই। নিজের কান দুটো দুবার সুট-সুট করে নেড়ে নিয়ে বললে, "হ্যাঁরে, চশমা। আমার দাদামশায়ের চশমা। কিচ্ছু নয়। রোগী এল। চশমা চোখে এঁটেছি। সঙ্গে সঙ্গে কী রোগ জেনে ফেলেছি। দাওয়াই দিয়েছি। ব্যস! একেবারে যাদু! মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে গেছে! উঃ! ভাবতেই কষ্ট হয় সেই চশমাটা হারিয়ে গেছে! তাও কী! সে আবার হারাল কেমন করে! সে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড! একবার এক রাজার ছেলের হল ভীষণ ব্যামো। ব্যামো মানে কী আর যেমন-তেমন! সাংঘাতিক! ছেলেকে এমনি দেখলে কিচ্ছু বুঝবে না। ছেলে খেলছে, দৌড়ুচ্ছে, বসছে, উঠছে, খাচ্ছে, শুচ্ছে। কিন্তু যেই কথা বলছে, শোন, ছেলে যেন গান গাইছে। ছেলের কথাগুলোর মধ্যে সব গানের সুর ঢুকে পড়েছে। মা বলে ডাকছে, ওমা, গেয়ে উঠছে সা-রে-গা-মা! মামা বলে হাঁকছে, শোন, গেয়ে উঠছে, নি-ধা-মামা! তখন লোক চলল এদেশ, লোক হাঁটল সেদেশ, লোক ছুটল বিদেশ।

ডাক পড়ল বাঘা-বাঘা কবরেজ আর বদ্যির। তারা ছেলের অসুখ ভাল করবে কী! অসুখ দেখেই তো থ। কেউ কিছু রোগের হদিসই করতে পারল না। কেউ বললে, ছেলের পেটে ফড়িং ঢুকেছে। কেউ বললে, ছেলে গান গিলে ফেলেছে! এ কী আর এতই সোজা! অগত্যা ডাক পড়ল এই শর্মার। রাজার চৌদোলা একেবারে আমার ঘরের দোরে হাজির।

"অনেকদূর রাজবাড়ি। একটি রাত পুরো পথে যাবে। তাও আবার সোজা পথ নয়, বনের পথ। বন পেরিয়ে রাজার দেশ। অন্ধকার রাত। চৌদোলা ছুটছে, দুলছে। আমারও চোখ জুড়িয়ে ঢুল লাগছে, ঘুম পাচ্ছে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়ালই নেই। যেখানেই যাই, চশমা কিন্তু সব সময় আমার চোখে! ঘুমুচ্ছি বটে, কিন্তু চশমা চোখ থেকে খুলি নি। পাগল! কেউ নিয়ে পালাক আর কী!

"চৌদোলায় দুলতে দুলতে, ঢুলতে ঢুলতে কখন যে আমার ল্যাজটা কাপড়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে ঝুলে পড়েছে, একদম বুঝতে পারি নি। ওমা! হঠাৎ আচমকা আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, আমার ল্যাজ ধরে কে টানছে আর বেদম পাক মারছে। উফ! কী সাংঘাতিক পাক! কোথায় ঘুম, কোথায় চৌদোলা! মার লাফ চৌদোলা থেকে মাটিতে! চৌদোলা উল্টে ছত্রাকার! লাফ দিয়েই মার ছুট। ছুটলে কী! ল্যাজ কিন্তু তেমনি পাক খাচ্ছে! আর কী কাতু-কুতুই না লাগছে! কে যে পাক দিচ্ছে ফিরে দেখবার ফুরসৎ কই? প্রাণ নিয়ে ছুটব, না ফিরে দেখব? ছুটতে ছুটতে হিমশিম খেয়ে গেছি। কাপড়-টাপড় খুলে মাটিতে লুটোপুটি। চশমাটাও চোখ থেকে ছিটকে পড়ল। অন্ধকারে যে একবার খুঁজে দেখব, তারও সুযোগ পেলুম না। আমাকে ছুটতেই হল। ল্যাজে যা তাড়া! তাড়া খেয়ে দিশেহারা!

"যখন ল্যাজের পাক ছাড়ল তখন সকাল। সারারাত তাড়া খেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।"

"বাঁচলুম বটে, কিন্তু সে বেঁচে লাভ কী! যা নিয়ে আমি বেঁচেছিলুম তাই তো আমার চলে গেল। আমার চশমা! হায়! হায়! আমার চশমাটা চিরদিনের মত হারিয়ে গেল! আমি এবার কী করব!"

কথা বলতে বলতে বদ্যিমশাই-এর গলা ভার-ভার হয়ে এল। বাজনা স্পষ্ট দেখলে বদ্যির চোখে জল চিকচিক করছে। বাজনার চোখ দুটোও যেন ঝাপসা হয়ে এল তাই দেখে।

সামলে নিল বদ্যিমশাই। যেন একটু গম্ভীর হয়ে উঠল। চোখে রাগ। খুব জোরে ঝাঁকুনি দিলে মাথাটা। শিং দুটোও নড়ে উঠল। বললে, "আমি এখনও ঠিক-ঠিক জানতে পারি নি কে আমার ল্যাজ টেনেছিল। তবে যতদূর মনে হয় হুমচক্কা! জানিস হুমচক্কা কে?" জিজ্ঞেস করে বাজনার মুখের দিকে তাকাল বদ্যিমশাই।

বাজনা ঘাড় নাড়লে, "আজ্ঞে না।"

"একটা ডাইনি। এ বনেই থাকে। আমার চশমাটা সে-ই চুরি করেছে।"

বাজনার মুখটা শুকিয়ে গেল।

"কোনদিন যদি সুযোগ আসে তো দেখে নেব একবার! হুম-চক্কার পিণ্ডি চটকিয়ে ছাড়ব! আমার ল্যাজে হাত দেওয়া! এত বড় অপমান!" বলে বদ্যিমশাই নিজের ল্যাজটা কাপড়ের ফাঁক দিয়ে দুবার পিঠের ওপর ঝাড়া দিলে। মাছি বসেছিল।

বাজনা শুকনো মুখে জিজ্ঞেস করলে, "তা হলে আমার কী উপায় হবে?"

বদ্যি বললে, "হবে। হবে না কেন! পারবি চশমাটা হুমচক্কার কাছ থেকে কেড়ে আনতে? পারিস যদি বুঝব বাহাদুর ছেলে।

আর তা যদি না পারিস, এখানে তোর আসাই সার। আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না। আমি অবশ্য সেদিন যথেষ্ট খোঁজাখুঁজি করেছি। কিন্তু হুমচক্কার পাত্তাই পাই নি। তবে জানিস খুঁজতে খুঁজতে সেই বন থেকে একটা চাবি কুড়িয়ে পেয়েছি। আমার স্থিরবিশ্বাস চাবিটা তারই। হুমচক্কার ঘরের চাবি। তুই যদি যাস, চাবিটা তোকে দিতে পারি।"

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল বাজনা। বললে, "আজ্ঞে আমি তো ছোটছেলে। এত বড় কাজ আমি কেমন করে পারব?"

এবার যেন ইচ্ছে করে অন্যমনস্ক হয়ে গেল বদ্যিমশাই। বললে, "আর বিরক্ত করিস না আমায়, যা!"

বাজনা এবার সত্যিই মুষড়ে গেল। বুঝলে, আর কোন উপায় নেই। বদ্যিমশাইকে বিরক্ত করেও কোন লাভ নেই। কিন্তু যেতেও ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে এত কান্ড করে শেষ পর্যন্ত বদ্যির দেখা পেয়েও সব পন্ড হয়ে গেল!

"কী রে, উঠছিস না?"

চমকে উঠল বাজনা। হতাশ সুরে জিজ্ঞেস করলে, "আজ্ঞে আমার তা হলে আর কিচ্ছু করার নেই?"

"বললুম তো না।"

"যদি যেতে হয়, যাচ্ছি। কিন্তু আজ্ঞে আমি তো হুমচক্কার দেশ কোনদিকে জানি না।"

"আমারও কি ছাই জানা আছে! শুধু নামটাই শোনা আছে! তবে হ্যাঁ, বেশ মনে আছে দক্ষিণদিকে গিয়েছিলুম। তুইও যা।"

খুবই মনমরা হয়ে বাজনা বললে, "আপনি যখন বলছেন তাই-ই যাই।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা। তুই পারবি। চশমাটা খুঁজে নিয়ে আয়, তোর একটা কেন দশটা রোগ সারিয়ে দেব। এই নে চাবিটা," বলে বদ্যি-

মশাই ট্যাঁক থেকে একটা ছোট্টমত চাবি বার করে বাজনার হাতে দিল। বাজনা অবাক হয়ে চাবিটার দিকে চেয়ে রইল। "আর শোন, এই পুঁটলিটা নিয়ে যা, খাবার আছে। খিদে পেলে খাবি।"

বাজনা চাবিটা ট্যাঁকে গুঁজলে। খাবারের পুঁটলিটা নিতে দোনো-মনো করল।

"আরে! নে, নে! আমার কাছে লজ্জা করার কিছু নেই।"

বাজনা পুঁটলিটাও হাতে নিলে। যা খিদে পেয়েছিল! মনে হচ্ছিল তখনই খুলে কিছু মুখে পুরে দেয়। না বাবা, শেষে বদ্যি-মশাই হয়তো মনে মনে ভাববে ছেলেটা ভীষণ হ্যাংলা! দরকার কী!

"তবে আসি।" বলে বাজনা বদ্যিকে আবার গড় করলে।

বদ্যি বললে, "নিশ্চয়ই আসবি।" বলে বদ্যি ঠ্যাং দুটো বাজনার মাথায় এমন জোরে ঠেকিয়ে দিল, উঃ! বাজনার মাথা ঝনঝন করে উঠল। মুখে টুঁ শব্দটি না করে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বেরিয়ে এল বাজনা। সুড়ঙ্গ পেরিয়ে রাস্তায় পড়ে টাট্টুকে বললে, "হয়েও হল না।"

টাট্টু বললে, "হবে, হবে, ঠিক হবে। চশমাটা পেলেই হবে।"

বাজনা উত্তর দিলে, "চশমা যদি পেয়েই যাই, তো এখানে আসার আর কী দরকার। চোখে দিয়ে নিজের রোগ নিজেই তো আমি সারিয়ে ফেলতে পারি!"

টাট্টু হাসল।

বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "হাসছ যে?"

"না, ভাবছি তুমি তা পার। কিন্তু তার আগে চশমাটা তো তোমায় খুঁজে বার করতে হবে। চল পা চালিয়ে হুমচক্কার বনে।"

বাজনা টাট্টুকে হাতে নিয়েই দক্ষিণে হাঁটা দিল।

বিকেল গড়িয়েই চলেছে। আর একটু পরে সন্ধে নেমে আসবে। তখন কী হবে? বাজনার কিন্তু মায়ের কথা একটুও মনে পড়ছে

না। মাকে ভুলে গেছে বাজনা। মা যে সারাদিন ধরে তাকে খুঁজছে, একবারও এ-কথা মনে এল না তার। না ভুলে উপায় কী! অমন যে গরু, বদ্যিমশাই সে-ও পর্যন্ত তার নাম শুনে হেসে উঠল। না, নাম তাকে পাল্টাতেই হবে!

হাঁটতে হাঁটতে সত্যি সত্যি সন্ধে হয়ে এল।

বাজনা ডাকলে, "টাট্টু!"

টাট্টু সাড়া দিলে, "হুঁ।"

"সন্ধে হয়ে গেল।"

"দেখছি তাই।"

"আর একটু পরেই তো রাত আসবে অন্ধকার।"

"হ্যাঁ। তার আগেই একটা আস্তানা খুঁজে বার করতে হবে। নইলে তোমার কষ্ট! আমার আর কী! আমি তো ঘোড়া, কাঠের।"

"না, না, আমার কোন কষ্টের ভয় নেই। কিন্তু রাতটা তো কাটাতে হবে! এমন ক'টা রাত কাটাতে হবে কে জানে! কোথায় হুমচক্কার বন, তুমিও জান না, আমিও জানি না। আমি তো কোন-দিন নামই শুনি নি।"

হঠাৎ টাট্টু বললে, "বাজনা, বাজনা, ওটা কী বলত?"

সন্ধের আবছা অন্ধকারে মনে হল একটা ভাঙা-ভাঙা মন্দির। তাই বাজনা হাঁটতে হাঁটতে ঐদিকেই এগিয়ে গেল। বললে, "টাট্টু, মনে হচ্ছে মন্দির।"

টাট্টু বললে, "আজ রাতটা তবে ওখানেই থাকা যাবে চল।"

বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "ভাঙা মন্দিরে?"

টাট্টু বললে, "হ্যাঁ, মন্দিরই তো ভাল। মন্দিরে ভয়ও নেই, ভাবনাও নেই।"

বাজনা উত্তর দিলে, "ঠিক বলেছ, তাই চল।"

অবশ্য মন্দিরে ঠাকুর নেই। বাইরে থেকে যতটা মনে হচ্ছিল ঠিক

ততটা ভাঙাও নয়। মেঝেটা বেশ তকতকে। গরমের দিনে গা এলিয়ে শুয়ে পড়লে আরামই লাগে।

অনেকক্ষণ আগেই খিদে পেয়েছে বাজনার। এখন আর থাকতে পারছে না। বদ্যির খাবারের বোঁচকাটা খুলতে খুলতে বাজনা বললে, "টাট্টু, বড্ড খিদে। খাচ্ছি।"

টাট্টু বললে, "রক্ষে! বদ্যি রোগ না সারাক এক বোঁচকা খাবার তো দিয়েছে। খাবার না পেলে কী হতো একবার ভাবো তো। খিদেয় ছটফট করতে তুমি। না, বদ্যি লোকটা ভাল!"

টাট্টুর কথা শুনে বাজনা এত কষ্টেও খিলখিল করে হেসে উঠল। বললে, "লোক! লোক কোথা দেখলে! ওমা! একটা আস্ত গরু তো!"

টাট্টুও হেসে উঠল। বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ! ভুল হয়ে যাচ্ছে!"

হাসতে হাসতে বাজনা বদ্যির বোঁচকার গিঁট খুলতে বসল। মন্দিরের ভেতরটা এরই মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। ভাল করে কিছু দেখাই যায় না। তাই আন্দাজেই বাজনা বোঁচকার বাঁধন ধরে টানামানি লাগিয়ে দিলে।

কিন্তু গিঁটটা যে অমন ফস করে খুলে যাবে, বাজনা ভাবতেই পারে নি। খুলে, বোঁচকা থেকে যেন কি একটা ঠুং করে ঘরের মেঝেয় পড়ল। তারপর ঠুং-ঠাং, ঠুং-ঠাং করে গড়াতে গড়াতে দেওয়ালের গায়ে গিয়ে আটকে গেল। যাঃ বাব্বা! এ আবার কী ধরনের খাবার!

বাজনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "টাট্টু, টাট্টু, বোঁচকার ভেতর থেকে এ আবার কী খাবার বেরুল, ঠুনঠুনিয়ে গড়িয়ে গেল?"

টাট্টু বললে, "খুঁজে বার কর।"

বাজনা বললে, "অন্ধকারে খুঁজি কোথা? তুমি আমার কাছে থাক।"

টাট্টু উত্তর দিলে, "বেশ তো আমাকে তোমার হাতেই রাখ। তাহলে অন্ধকারে আমার হারিয়ে যাবার ভয় থাকবে না।"

"সেই ভাল।" বলে বাজনা টাট্টুকে হাতে নিয়ে, হারিয়ে যাওয়া সেই ঠং-ঠাং গড়ানে খাবারটা হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগল।

আরে! কই খাবার? এটা তো বেশ শক্ত! হাতে ঠেকতেই বাজনা বুঝতে পেরেছে। আর একটু পরখ করতেই বাজনা বুঝলে, এটা খাবারই নয়, একটা বাঁশি! চেঁচিয়ে উঠল বাজনা, "টাট্টু, টাট্টু, বাঁশি!"

টাট্টু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "বাঁশি?"

"হ্যাঁ, এই তো দেখ না," বলে বাজনা ফুঁ দিল বাঁশিতে।

আর দেখতে! আচমকা কী জোর বেজে উঠল বাঁশিটা! কী ভয়ঙ্কর শব্দ! বুক কেঁপে উঠল বজনার! সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল! মনে হল চারিদিকে তুলকালাম চলেছে। বাঁশির সেই বিচ্ছিরি শব্দটা লক্ষ লক্ষ সাপের মত ফোঁস ফোঁস করে ঘুরপাক খাচ্ছে ঘরের ভেতর, আব যেন সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। বাজনার কান ফেটে যাচ্ছে। চোখও চাইতে পারছে না। মনে হচ্ছে কাছে-পিঠে আগুন লেগে গেছে। রাশ রাশ ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে ছুটে ছুটে আসছে ঘরের ভেতর। বাজনার চোখে-মুখে-নাকে ঢুকে নিঃশ্বেস বন্ধ করে দিচ্ছে! এতক্ষণ বাঁশিটা হাতেই ছিল বাজনার। ভয়েময়ে ছুড়ে ফেলে দিল ঘরের বাইরে! দুম! উঃ! কী শব্দ! কেঁপে উঠল চারিদিক! কড়-কড়-কড়! যেন সারা পৃথিবীটাই টলে টলে কাঁপছে আর ভাঙছে!

কিন্তু দেখো, তারপরই হঠাৎ লক্ষ সাপের ফোঁস-ফোঁসানি থেমে গেল। রাশ রাশ ধোঁয়া মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে আলো ফুটল!

সত্যিই তা, আলো! একেবারে দিনের আলো! কোত্থেকে এল দিনের আলো? এতক্ষণ তো অন্ধকার ছিল, হঠাৎ দিন হল কেমন করে! অবাক হয়ে চেয়ে দেখল বাজনা। চেয়ে থাকতে থাকতে আচমকা থতমত খেয়ে যায় বাজনা! আরি! মন্দিরটা গেল কই? ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে তো মন্দির নেই! এটা তো একটা মস্ত তোরণ! তোরণের নিচ দিয়ে ইয়া চওড়া একটা রাস্তা চলে গেছে সামনের দিকে। তোরণের ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাজনা। আচ্ছা তাজ্জব ব্যাপার তো! হাঁদার মত ফ্যালফ্যাল করে দেখতে দেখতে কাঁপতে লাগল বাজনা।

হঠাৎ টাট্টু চুপিসাড়ে কথা কয়ে উঠল, "কী হল বাজনা? ভয় লাগছে?"

"উঁ!" চমকে ওঠে বাজনা। "না, না," সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে

সামলে নিল।

"অবাক লাগছে?" টাট্টু জিজ্ঞেস করলে।

ধরা-ধরা গলায় বাজনা উত্তর দিল, "টাট্টু, দেখছ, মন্দিরটা কোথায় উড়ে গেছে! আমরা একটা তোরণের নিচে দাঁড়িয়ে আছি।"

টাট্টু বললে, "আশ্চর্য তো!"

"আশ্চর্য বলে আশ্চর্য! দেখো না তোরণের নিচ দিয়ে একটা কেমন ঝকঝকে রাস্তা চলে গেছে।"

টাট্টু ফিসফিসিয়ে বাজনাকে বললে, "ঐ রাস্তায় হাঁটা দাও।"

"তারপর যদি আবার কিছু হয়?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে বাজনা।

"যে-রাস্তা সামনে সে-রাস্তাতেই এখন এগিয়ে যেতে হবে। ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে কোন কাজ হয় না।"

ঠিক বলেছে টাট্টু। মনে মনে ভেবে নিয়ে হাঁটা দিল বাজনা সামনে।

ওমা! একটি পা ফেলেই থমকে দাঁড়ায় কেন বাজনা?

এতক্ষণ একটিও বাড়ি ছিল না চোখের সামনে, রাস্তার ধারে। যেই একটি পা পড়েছে বাজনার, অমনি একটি বাড়িও নজরে পড়েছে! কোথা ছিল বাড়িটা?

না, হয়তো ভুল দেখেছে বাজনা! তাই আবার হয় নাকি! নিশ্চয়ই বাড়িটা ছিল। ও হয়তো নজর করে নি আগে। তাই আবার চারিদিক ভাল করে দেখে পা ফেলল। হাঁটা দিল।

ব্যস! ঠিক যা ভাবা, তাই! আবার একটা বাড়ি হুস করে একেবারে বাজনার চোখের ওপর থমকে দাঁড়াল।

এবার সত্যিই থতমত খেয়ে গেল বাজনা। তাই টাট্টুকে ফিস-ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কী হচ্ছে এসব?"

টাট্টু বললে, "চুপ! একদম কথা বলো না। তাড়াতাড়ি হেঁটে

চল। যা হচ্ছে হতে দাও।"

"সেই ভাল," বলে বাজনা খুব জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে চলল।

দেখতে দেখতে সত্যিই চারিদিকে বাড়ি আর বাড়ি। বাজনা সামনে দিকে চেয়ে দেখল, অগুনতি ঝকঝকে বাড়ি! পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, অসংখ্য ফুটফুটে বাড়ি!

কোন বাড়িটা ছোট-ছোট,
কোন বাড়িটা বড়-বড়।
কোন বাড়িটা উঁচু-উঁচু,
কোন বাড়িটা নিচু-নিচু।

হাঁটতে হাঁটতে বাজনা ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, ঝকঝকে-ফুটফুটে অগুনতি বাড়ির মাঝখানে এসে পড়ল। সত্যিই বাড়ির চেহারা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। রঙ দেখলে মন ভরে যায়। তাই হাঁটতে হাঁটতে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে পড়ল বাজনা। বাজনার মন বলছে এখন দেখি। মন ভরে শুধু বাড়ির ছবি দেখি!

টাট্টু জিজ্ঞেস করলে, "বাজনা দাঁড়াও কেন?"

বাজনা বললে, "আঃ! দেখতে বড্ড ভাল লাগছে। কত রঙ দেখো! আহা! কিন্তু টাট্টু, এত বাড়ি, রঙ-বাহারি, এত রাস্তা ঝকমকে, তকতকে অথচ দেখো, একটিও তো লোক নেই, জনমনুষ্যি নেই! কী ব্যাপার!"

টাট্টু বললে, "হ্যাঁ, তাইতো দেখছি। আশ্চর্য! এগিয়ে চল তো। ভাল করে দেখি।"

বাজনা উত্তর দিলে, "তাই চল।"

টাট্টু বললে, "খুব সাবধান। লুকিয়ে চল। বিপদ আসতে পারে!"

টাট্টুর কথা শুনে তাই বাজনা সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হল। টাট্টুকে

হাতে নিয়ে এ-বাড়ির আড়াল দিয়ে, ও-বাড়ির পেছন দিয়ে এগিয়ে চলল খুব চুপিসাড়ে! উঁকি মারল এদিক ওদিক, কিন্তু কারো টিকিটি পর্যন্ত নজরে পড়ল না।

বাজনা তাই আবার অবাক-সুরে বললে, "টাট্টু, কেউ নেই কোথাও!"

টাট্টু জিজ্ঞেস করলে, "এখানে প্রাণও নেই, প্রাণীও নেই?"

বাজনা বললে, "নজরে পড়ছে না তো।"

টাট্টু বললে, "চল একটা বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখি।"

বাজনা ভয়ে ভয়ে বললে, "না বাবা! কেউ দেখে ফেললে!"

"দেখছ তো কেউ নেই।"

"বাড়ির ভেতর তো থাকতে পারে।"

"তা হলে এক কাজ কর," টাট্টু বললে, "একটা বাড়ির জানলা দিয়ে আগে উঁকি মেরে দেখো।"

"ঠিক বলেছ," বলে বাজনা আলতো-পায়ের ডিঙি মেরে একটা বাড়ির জানলার সামনে এসে ঘাপটি মেরে দাঁড়াল। আড়চোখে এদিক ওদিক দেখে সত্যি সত্যি জানলার ভেতর দিয়ে উঁকি দিলে। না, কেউ নেই! দরকার কী! সন্দেহ থাকে কেন! তাই জানলার গরাদ ধরে উঠে দাঁড়াল। আরও ভাল করে দেখল। না, সত্যিই কেউ নেই।

বাজনা চাপা গলায় টাট্টুর কানের কাছে মুখ এনে বললে, "টাট্টু, এ-বাড়িতে কেউ নেই।"

টাট্টু বললে, "কই দেখি তো আমি। আমায় একটু তুলে ধর।"

টাট্টুকে তুলে ধরল বাজনা।

টাট্টু এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে বললে, "হ্যাঁ-তো-রে, কেউ নেই তো বাড়ির ভেতর! চল ভেতরে যাই।"

বাজনা দরজা ঠেলে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল।

উরি বাবা! কী বিরাট বাড়ির ভেতরটা। কত ঘর! একটা ঘর, দুটো ঘর, ঘরের ভেতর ঘর। ছোট ঘর, বড় ঘর। গোনা যায় না। বাগান দেখো কী সুন্দর!

একটা ঘরে উঁকি মেরে দেখল বাজনা। ওমা! কিচ্ছু নেই ঘরের ভেতর। না পালংক, না খাট, না দেরাজ, না সিন্দুক!

তবে?

ঘরের দেওয়াল ভর্তি পাখির ছবি খোদাই করা। লোক নেই, জন নেই, কে খোদাই করল এত পাখি! কী সুন্দর দেখতে পাখি-গুলো। কত রকমের। কত রঙ ডানায়-ডানায়, পালকে! আবার দেখো, চোখে-চোখে মুক্তা বসানো! দেখলেই মনে হয় যেন মিটমিট করে চাইছে!

বাজনা অবাক হয়ে ডাকল, "টাট্টু, টাট্টু!"

"কী? কী?"

"পাখিগুলো যদি দেওয়ালে খোদাই করা না থাকত, ক'টা সঙ্গে নেতুম।"

টাট্টু উত্তর দিলে, "সঙ্গে নিতে হবে না। যখন লোকজন কেউ নেই, হয়তো গোটা বাড়িটাই তোমার হয়ে যেতে পারে!"

"সত্যি!" বাজনার মুখখানা খুশিতে উপচে গেল।

টাট্টু বললে, "দেখেশুনে তাইতো মনে হচ্ছে।"

"তবে চল পাশের ঘরটা দেখি," বলে বাজনা পাশের ঘরে পা বাড়াল।

আরি সব্বনাশ! পাশের ঘরে পা দিয়েই বাজনার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কী কান্ড! এ-ঘরে একী! এ যে শুধু সোনার গয়না আর রুপার মোহরে ভর্তি! সারা ঘরে শুধু সোনার গয়না ছড়ানো, সাজানো, দোলানো। সোনা দুলছে আর টুং টুং বাজছে।

বাজনার চোখ দুটো কাঁপতে লাগল। টুং টুং শব্দ শুনে পা

দুটোও নাচতে লাগল। বললে, "টাট্টু, টাট্টু, কত সোনার গয়না! কত মোহর দেখ!"

"নিতে ইচ্ছে করছে?"

"কেউ দেখে ফেললে!"

"কেউ-ই তো নেই! দেখবে কে?"

"তবে নি।" বলে বাজনা এক মুঠো মোহর নিয়ে কোঁচড়ে রাখলে।

টাট্টু বললে, "এবার আর একটা ঘরে চল, দেখি।"

আয়ি সাবাস! এ-ঘরটা বিরাট। কত উঁচু! মধ্যিখানে কী বড় একটা ঘণ্টা ঝুলছে!

বাজনা বললে, "টাট্টু, টাট্টু, এ-ঘরে একটা ঘণ্টা দেখো কত বড়!"

"বাজাও না!"

"কেউ শুনতে পেলে!"

"কেউ থাকলে তবে তো শুনবে!"

"তবে বাজাই," বলে বাজনা ঘণ্টার দড়ি ধরে টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বেজে উঠল, ঢং ঢং, ঢং ঢং। উঃ, কী সাংঘাতিক শব্দ! কান ফেটে যাবার গোত্তর!

টাট্টু ব্যস্ত হয়ে বললে, "বাজনা, বাজনা, ঘণ্টা থামাও!"

বাজনা তাড়াতাড়ি দড়িটা টেনে ধরল। যাঃ চ্চলে! ঘণ্টা তো থামল না! ঢং ঢং ঢং! বাজছে তো বাজছেই!

আরও জোরে টেনে ধরল।

ঘণ্টার বয়েই গেছে, সে যেমন বাজছিল তেমনিই বাজছে!

বাজনা চেঁচিয়ে উঠল, "টাট্টু, টাট্টু, ঘণ্টা থামছে না!"

টাট্টু বললে, "আরও জোরে টান দাও।"

বাজনা গায়ে যত জোর ছিল, টান দিল। টানতে টানতে ঝুলে

পড়ল। এই সব্বনাশ! ঘণ্টার দড়িও দুলছে, বাজনাও ঝুলছে, ঘণ্টাও বাজছে, ঢং ঢং ঢং!

"টাট্টু, টাট্টু, মুশকিল! কিছুতেই থামছে না।"

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে টাট্টু! থমকে তাকায় বাজনা টাট্টুর চোখের দিকে। জিজ্ঞেস করে, "কী?"

টাট্টু মুখখানা ভয়ে কাঁচুমাচু করে বললে, "শোন, শোন, বাইরে যেন ঘোড়া ছুটছে!"

বাজনা ঘণ্টার দড়ি ছেড়ে ছুটে গেল পাখির ঘরে। পাখির ঘরে জানলায় মুখ বাড়িয়ে রাস্তার দিকে উঁকি দিলে।

তাইতো! তাইতো!

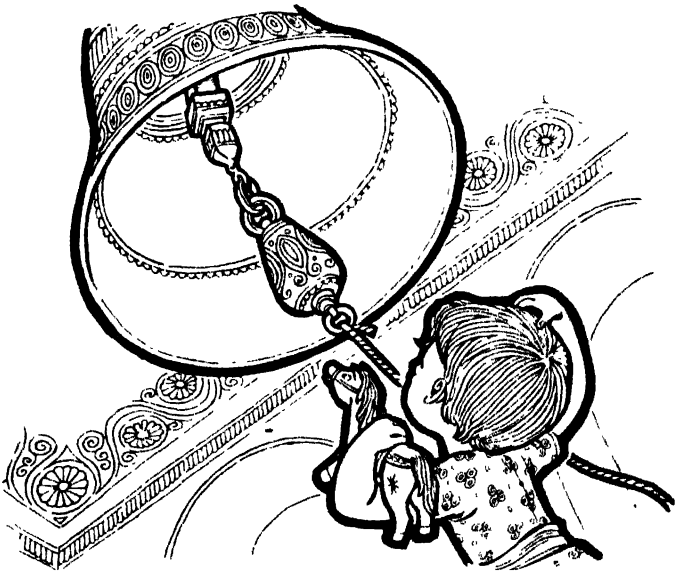

ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজছে, টগ-বগ, টগ-বগ ঘোড়া ছুটছে, গাড়ি টানছে। এক্কাগাড়ি!

"টাট্টু, টাট্টু, অবাক কাণ্ড!" চেঁচিয়ে উঠল বাজনা।

"কী হয়েছে, দেখি দেখি!" টাট্টুও জানলা দিয়ে উঁকি দিলে।

কী দেখল? দেখল কী, এতক্ষণ তো লোক ছিল না পথে-ঘাটে, এখন লোক চলেছে। লোক চলেছে, একজন না, দুজন না, দলে দলে। ছোট ছোট ছেলে যাচ্ছে, মেয়ে যাচ্ছে। বড় বড় লোক যাচ্ছে, ঘোড়া-জোতা গাড়ি ছুটছে, উট-টানা রথ চলছে।

দেখতে দেখতে বাজনার চোখ জুড়িয়ে গেল। অবাক হয়ে চেয়ে রইল ঠায় জানলা দিয়ে।

ঘণ্টা কিন্তু এখনও বাজছে ঢং ঢং ঢং!

অবাক কথা! এ আবার কোন দেশী ঘণ্টা, আপনা-আপনি বেজেই চলেছে। যাদু নাকি!

বাজনা বললে, "টাট্টু, টাট্টু, ঘণ্টাটা বোধ হয় যাদু জানে! তা না হলে ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো সব বেরিয়ে এল কোত্থেকে?"

ঘণ্টা বাজছে। বাজছে।

ঢং

ঢং

ঢং।

হঠাৎ আবার বাজনা অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "টাট্টু, টাট্টু, দেখো, দেখো, কারা আসছে!"

টাট্টু বললে, "মনে হচ্ছে পল্টন।"

"তারা কারা? দেখো, দেখো, সকলের কেমন একই রকম জামা একই রকম পাগড়ি। কেমন দেখো একসঙ্গে পা ফেলছে, হাত নাড়ছে। কোমরে আবার তরোয়াল! কী করবে তরোয়াল দিয়ে?"

"এই ছেলেটা!"

ধক করে ওঠে বাজনার বুকটা। কে যেন ডাকল!

চট করে চাইল বাজনা পেছন দিকে। ঘরের ভেতর কেউ নেই। ঘরের দেওয়ালে খোদাই করা পাখিগুলো তেমনিই চুপ বসে আছে। কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। না, বোধ হয় বাজনা ভুল শুনেছে। আবার বাজনা জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

"এই ছেলেটা, এই ঘোড়াটা!" আবার যেন সেই ডাকটা বাজনাকে চমকে দিল।

এবার বাজনা সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। টাট্টুও চোখ ফেরালে, বাজনাও মুখ ঘোরালে। বাজনা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, "টাট্টু, টাট্টু, কে যেন ডাকছে!"

টাট্টু জিজ্ঞেস করলে, "কার গলা বলত?"

"আমরা, আমরা ডাকছি।"

ওমা! দেখো, দেখো, দেওয়ালে খোদাই করা পাখিগুলো কথা বলছে! কী আশ্চর্য!

বাজনা অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে টাট্টুকে বললে, "টাট্টু, দেওয়ালের পাখিগুলো কথা বলে যে!"

"তাই নাকি!" চেয়ে দেখল টাট্টু। "তাইতো! যেন মিটির মিটির চাইছে।"

বাজনা এগিয়ে গেল। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

এই দেখো! কোথাও কিচ্ছু নেই, হঠাৎ পাখিগুলো দেওয়াল থেকে বেরিয়ে এল। উড়ে উড়ে ঘরের এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল, আর ডাকতে লাগল,

"এই ঘোড়া, এই ছেলে, পালা, পালা, পালা,
পল্টন এলে পরে পায়ে দেবে তালা।"

বাজনা পাখির কথা শুনলই না। উল্টে ঘোড়াকে বললে, "টাট্টু, টাট্টু, একটা পাখি ধরব?"

টাট্টু বললে, "ধরে রাখবে কোথা?"

"আগে তো ধরি।" বলে বাজনা দৌড়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। বন্ধ করে "হুস-হাস" করে তাড়া দিলে পাখিগুলোকে। ওমা! কোথায় পাখি, কোথায় কী! উড়তে উড়তে পাখিগুলো যেখানে ছিল সেখানেই চলে গেল। আবার দেওয়ালে খোদাই করা ছবি হয়ে বসে রইল!

বাজনা বললে, "তাজ্জব! তাজ্জব!"

পাখিগুলো আবার চেঁচিয়ে উঠল, "ধরলে, ধরলে, পল্টন ধরলে।"

বাজনা ছুটে জানলার কাছে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ বাড়িয়ে দেখলে, তাইতো! পল্টনগুলো এদিকেই তো আসছে!

ব্যস্ত হয়ে বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "টাট্টু, টাট্টু, কী করি?"

টাট্টু বললে, "লুকিয়ে পড়ি!"

"কোথায় লুকাব?"

"ঘর থেকে বাইরে চল।"

ঘর থেকে ছুট দিল বাজনা।

ঢং

ঢং

ঢং

ঘণ্টা এখনও বাজছে।

গট

মট

গট

পল্টন এদিকেই আসছে।

ঘণ্টা বাজছে,

পল্টন আসছে,

বাজনা ছুটছে।

বাড়িটা যত বড়, উঠোনটাও তত বড়। দালানটা যত লম্বা, বাগানটাও তত চওড়া।

ছুটতে ছুটতে বাগানে এল বাজনা। লুকিয়ে পড়ল ঝোপের আড়ালে।

গট

মট

গট

সামনে সামনে কে আসছে?

পল্টন-পল্টন সর্দার-পল্টন।

বাব্বা! সর্দারের কী চেহারা! এইটুকু গেঁট্টা! গালে গালপাট্টা! খাড়া-খাড়া গোঁফ জোড়া! মুখখানা হাঁড়িপারা! গলাটা কী জোরদার! সর্দার চেঁচাল, "এই হো, কই হ্যায়?"

হ্যায়?

হ্যায়?

হ্যায়?

সঙ্গের পল্টনগুলোও চেঁচিয়ে উঠল। কেঁপে উঠল ঘর-দালান। বাজনাও টাট্টুকে নিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁপে উঠল।

সর্দার আবার হাঁকলে, "এই হো!"

হো!

হো!

হো!

পল্টনগুলোও হাঁক দিলে।

না, কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই।

সর্দার হুকুম দিল, "ঘরগুলো দেখ, দেখ!"

অমনি সঙ্গে সঙ্গে অন্য পল্টনগুলো চেঁচিয়ে উঠল,

দেখ

দেখ

দেখ

দেখ

চেঁচাতে চেঁচাতে এ-ঘর ও-ঘর ছুটে ছুটে দেখতে লাগল। খুঁজতে লাগল।

কাউকে দেখতে পেলে না। পল্টনগুলো চেঁচিয়ে উঠল,

নেই

নেই

নেই

নেই

সর্দার পল্টন মোচে তা দিলে। ভাবলে, তাইতো! নেই তো বাজল কেন ঘণ্টাটা? নেই তো খুলল কেন দরজাটা? নেই তো নোংরা কেন বাইরেটা? ভাবতে ভাবতে আবার চেঁচিয়ে উঠল, "তবে দেখ বাগানটা।"

অমনি পল্টনগুলো বাগানের দিকে ছুটল।

বাজনার মুখ শুকিয়ে আমচুর। বললে, "টাট্টু, পল্টনগুলো এদিকেই আসছে! কী হবে!"

টাট্টু জিজ্ঞেস করলে, "পালাবার রাস্তা নেই?"

"দেখছি না।"

"লুকোবার জায়গা নেই?"

"পাচ্ছি না।"

"তবে গাছের ওপর উঠে পড়।"

"ঠিক বলেছ," বলে বাজনা একটা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গাছের মাথায় তরতর করে উঠে পড়ল। গাছের পাতার আড়ালে তড়িঘড়ি লুকিয়ে পড়ল।

পল্টনরা এ-গাছের আড়াল দেখে।

ওগাছে উঁকি মারে।

এ-ঝোপটা নাড়া দেয়।

ওদিকটা তাড়া দেয়।

কিন্তু বাজনাকে দেখতেই পেল না! খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে হঠাৎ একটা পল্টন মাটির দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "সর্দার, একটা মোহর!"

এইরে! বাজনার কোঁচড় থেকে পড়ে গেছে!

সর্দার দৌড়ে এল। মোহরটা তুলে নিল। মোহরের ঘরের দিকে ছুট দিল। ভাবল, তাহলে তো মোহর চুরি গেছে!

পল্টনগুলোও সর্দারের পিছু পিছু ছুট দিল।

বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "টাট্টু, কী হবে? ধরা পড়ে গেছি!"

টাট্টু বললে, "পড়ল কী করে?"

"কি জানি।"

"চুপচাপ বসে থাক।"

বাজনা গাছের ওপর চুপচাপ বসে রইল।

সর্দার-পল্টন ছুটতে ছুটতে মোহরের ঘরে ঢুকল।

পল্টনগুলোও ঢুকল।

সর্দার-পল্টন মোহর গুনতে লাগল।

পল্টনগুলোও গুনতে লাগল।

সর্দার-পল্টন গুনতে গুনতে হাঁপিয়ে গেল।

পল্টনগুলোও হাঁপিয়ে গেল।

সর্দার-পল্টন উঠে দাঁড়াল।

পল্টনগুলোও উঠে দাঁড়াল।

সর্দার-পল্টন চেঁচিয়ে উঠল, "চোর।"

পল্টনগুলোও চেঁচিয়ে উঠল,

চোর,

চোর,

চোর।

সর্দার-পল্টন ছুট দিল, "চোর।"

পল্টনগুলোও ছুটতে লাগল,

চোর,

চোর,

চোর।

ছুটতে ছুটতে পল্টন-সর্দার বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

অন্য পল্টনগুলোও সর্দারের পিছু পিছু ছুটতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে পল্টনগুলো বাজনার চোখের বাইরে চলে গেল।

যখন আর কাউকে দেখা গেল না, চারিদিক নিশ্চুপ, নিথর, তখন বাজনা টাট্টুর কানে কানে জিজ্ঞেস করলে, "এবার কী কবব?"

টাট্টু জিজ্ঞেস করলে, "কাছে-পিঠে কাউকে দেখতে পাচ্ছ?"

"না, সব্বাই চলে গেছে।"

"ঠিক দেখেছ?"

"হ্যাঁ দেখেছি।"

"তবে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নামো।"

বাজনা চুপচাপ, ঝুপঝাপ গাছ থেকে নেমে পড়ল। যেই নামল, ওমা! কারা আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, "চোর, চোর।"

বাজনার বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠল। বাজনা ভয়েময়ে চেঁচিয়ে উঠল, "টাট্টু, টাট্টু।"

টাট্টু বললে, "ছুট ছুট।"

বাজনাও মার ছুট!

ছুটতে ছুটতে পাখির ঘরে ঢুকে পড়ল। দরজায় খিল এঁটে লুকিয়ে রইল।

লুকিয়ে থাকলেই হল! ওমা! দেওয়ালে খোদাই পাখিগুলো উড়তে আরম্ভ করে দিলে আবার ঘরের চারিদিকে। ডাকতে লাগল, "চোর, চোর।"

বাজনা একেবারে হাঁদারাম! খিল খুলে দে ছুট। পালা, পালা, পালা।

ছুটতে ছুটতে বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "টাট্টু, টাট্টু, কী করি?"

টাট্টু বললে, "সরে পড়ি।"

"কোথায়?"

"রাস্তায়।"

রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল বাজনা।

রাস্তায় বেরুতেই টাট্টু বললে, "আর ছুটো না।"

"তবে?"

"ঐ এক্কাটার পেছনে উঠে পড়।"

সামনে একটা এক্কাগাড়ি ছুটছিল। বাজনা তার পেছনে টুপ করে উঠে পড়ল। উঠে ঘাপটি মেরে পেছনে বসে রইল।

যাঃ! এক্কা ছুটতে ছুটতে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সহিস দেখতে পেয়েছে।

টাট্টু চেঁচিয়ে উঠল, "বাজনা পালাও।"

বাজনা আগুপিছু কিচ্ছু ভাবল না। টাট্টুর কথা শুনেই এক্কার পেছন থেকে লাফ দিয়ে মার ছুট!

সঙ্গে সঙ্গে সহিসও চেঁচিয়ে উঠেছে, "ভাগলো, ভাগলো।"

ছুটতে ছুটতে বাজনা লুকিয়ে পড়েছে।

সহিসও পিছু নিল।

বাজনা বড় বাড়িটার আড়ালে লুকাল।

সহিস ছোট বাড়িটার পেছনে দাঁড়াল।

বাজনা সরু গলিতে ছুট দিলে।

সহিস কানা গলিতে হাঁক দিলে।

হাঁক দিলে কী হবে? বাজনা সরু গলি ধরে পগারপার। সরু গলিতে লোক ছিল না রক্ষে!

পগারপার বললেই কী পার পাওয়া যায়!

সরু গলি পেরুতেই ছোট গলি।

ছোট গলি ডিঙুতেই বড় গলি।

বড় গলি মাড়াতেই ধাঁধা।

ছোট গলি,

বড় গলি,

কানা গলি,

সরু গলি!

যাঃ! ধাঁধায় পড়ে গেছে বাজনা! কিছুতেই বেরুতে পারছে না। ঘুরে-ফিরে একই রাস্তায় বার বার পড়ছে, ছুটছে আর ভোঁচক্কর খাচ্ছে।

বাজনা ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে টাট্টুকে বললে, "টাট্টু, টাট্টু, ভারি মুশকিল!"

"কেন? কী হল?"

"এ-গলি, সে-গলি একই গলিতে ছুটছি। ধাঁধায় পড়ে গেছি। বেরুবার রাস্তা পাচ্ছি না!"

টাট্টু বললে, "চেষ্টা কর। বেরুতেই হবে। নইলে নির্ঘাৎ বিপদ!"

"আর পারছি না যে! ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে গেছি।"

"তবে চট করে আড়ালে একটু জিরিয়ে নাও।"

খুঁজে-পেতে একটু আঁধি-আঁধি ছায়া-ছায়া জায়গা দেখতে পেলে বাজনা। ছুটে গিয়ে ঐ অন্ধকার-ছায়ায় লুকিয়ে পড়ল।

হাঁপাতে-হাঁপাতেই বাজনা বললে, "টাট্টু, এদিকটা বেশ অন্ধকার, সহজে কেউ দেখতে পাবে না।"

টাট্টু বললে, "চুপটি করে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাক। দেখো, কারো নজরে না পড়ে যাও।"

"টাট্টু, বসব?"

"বস।"

বাজনা বসে পড়ল। বসে বসে জিরুতে লাগল। বুকের যা ধুক-পুকুনি! সহজে কী থামতে চায়!

থামল একটু পরে। একটু পরে আবার ফিসফিসিয়ে বাজনা টাট্টুকে বললে, "টাট্টু, কী করতে কী হয়ে গেল!"

টাট্টু জিজ্ঞেস করলে, "কেন? কী হল?"

"আমার তো নামের কোন কিনারা হল না, খালি একটার পর একটা বিপদেই পড়ছি!"

"ভাল কিছু পেতে গেলে এমন অনেক বিপদ কাটিয়েই তবে পেতে হয়। সহজে যা পাওয়া যায় তার কী দাম!"

"হ্যাঁ, যাকগে! যত পারে বিপদ আসুক! হুমচক্কার দেশ আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে। নাম আমাকে পাল্টাতেই হবে!"

টাট্টু জিজ্ঞেস করলে, "কোঁচড়ে মোহরগুলো ঠিক আছে তো?"

বাজনা কোঁচড়টা ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখে নিয়ে বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভাল করে বেঁধে রেখেছি!"

"আর ট্যাঁকে বদ্যির দেওয়া চাবিটা?"

চাবির কথা শুনে বুকটা ধক করে উঠল বাজনার। এতক্ষণ মনেই ছিল না। ট্যাঁকে চট করে হাত দিয়ে বাজনা দেখে নিয়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, চাবিও আছে।"

টাট্টু বললে, "খুব সাবধান, যেন হারায় না! তা হলে কিন্তু সব মাটি!"

"না, না। পাগল!" বলে বাজনা ট্যাঁকের কাপড়ে আর একটা পাক দিয়ে চাবিটা আরও শক্ত করে এঁটে রাখল।

টাট্টু বললে, "আর বেশিক্ষণ বসা ঠিক নয়। দেখোদিকি সহিস-টাকে দেখতে পাচ্ছ কিনা!"

"দেখব?" উঠে দাঁড়াল বাজনা। এগিয়ে গেল ক' পা।

টাট্টু বললে, "খুব সাবধান! খুব চুপিসাড়ে এদিক ওদিক দেখে হাঁট!"

বাজনা ভয়ে জুজুবুড়ি। গুটিগুটি পা ফেলল।

একটুখানি হাঁটতেই বাজনা থমকে দাঁড়ায়। হঠাৎ কানে যেন কিসের শব্দ ভেসে আসছে! মিষ্টি মিষ্টি!

টাট্টু জিজ্ঞেস করলে, "বাজনা, দাঁড়াও কেন?"

বাজনা কান পেতে শুনতে শুনতে বললে, "শুনতে পাচ্ছ?"

"কী?"

"জলতরঙ্গ বাজছে!"

"কই?" টাট্টুও কান পাতল। "তাইতো!"

"চল, এগিয়ে দেখি।" এগিয়ে চলল বাজনা। এত মিষ্টি আহা!

বাজনা যত এগিয়ে চলেছে, সুরও তত কাছে এগিয়ে আসছে। কাছে, আরও কাছে। শুনতে শুনতে অনেকদূরে চলে এসেছে বাজনা। কোথায় চলেছে, একদম খেয়াল নেই তার!

টাট্টু বললে, "কই? কিচ্ছু তো দেখা যাচ্ছে না! শুধু শোনাই যাচ্ছে!"

বাজনা উত্তর দিলে, "তাইতো দেখছি। যেন ভেল্কি!"

"কোনদিক থেকে আসছে বল তো শব্দটা?"

"কী জানি বুঝতে পারছি না।"

"অবাক কাণ্ড! মনে হচ্ছে কাছেই কোথাও বাজছে, অথচ চোখে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।"

সামনে বাজতে বাজতে হঠাৎ মনে হল জলতরঙ্গের সুর যেন বাজনার পেছনেই বেজে উঠেছে। চমকে পেছনে ফিরল বাজনা। পেছনে ফিরতেই আবার সামনে বেজে উঠল। আঁতকে সামনে চাইল বাজনা। সামনে বেজেই এবার এগিয়ে চলেছে সুরটা। বাজনাও এগিয়ে চলেছে।

যাঃ! বাজনা বিপদের কথা একদম ভুলে গেল। টাটুর মুখেও কথা নেই, বাজনাও চুপচাপ। দুজনেই বোবা। আনমনা। বিপদ যে আসতে পারে একথা আর মনেই নেই। শুধু সুর শুনতে শুনতে এগিয়ে চলল।

চলতে চলতে বাজনা যেন একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল। বোঝা যায় না এটা পাহাড়ের গুহা, না মাটির নিচে সুড়ঙ্গ। আঃ! জলতরঙ্গের সুরটা এবার যেন বাজনার কানের কাছে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে!

সত্যি সত্যি বাজনারও মনটা খুশিতে ভরে গেল। বুকখানা আনন্দে ঝিকমিক করে উঠছে!

হঠাৎ দূরে আলো দেখা গেল। মনে হল কে যেন সেই জমাট অন্ধকারের কপালে আলোর টিপ পরিয়ে দিয়েছে। প্রথমে একটি, তারপর আরও একটি, তারপরে একটি, দুটি, তিনটি, অসংখ্য আলো! আলোর শেষ নেই। শুধু আলো আর আলো! আলোর মধ্যে দিয়েই চলেছে বাজনা।

আচমকা এক বিকট চিৎকার, "এই-হো-হো-হো!"

বাজনা চমকে ওঠার আগেই দপদপ করে সব আলো নিমেষের মধ্যে নিভে গেল। আবার অন্ধকার। জমাট অন্ধকার। তারপর সব

থমথম। না জলতরঙ্গের সুর, না কিচ্ছু! তাইতো! এ আবার কী!

আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে হাতড়েও বাজনা পথ চিনতে পারল না! এবার বাজনা ভুল বুঝতে পেরেছে! এইরে! নিশ্চয়ই তাকে জলতরঙ্গের শব্দ শুনিয়ে এই সুড়ঙ্গে বন্দী করে ফেলেছে! কী হবে এবার!

বাজনার কান্না পেয়ে গেল। কিন্তু কাঁদবে কী! ভয়েই গলা কাঠ!

এমন সময় বাজনার পেছনে কে ধমক দিলে, "এই-ই-ই।" কী ভয়ঙ্কর গলা! বিচ্ছিরি!

বাজনা "আঁক" করে আঁতকে উঠল। ভয়েময়ে অন্ধকারেই ছুট দিলে।

ছুটলেই হল! হঠাৎ আবার কে যেন হেসে উঠল বাজনার সামনে. "হো-হো-হো!"

বাজনা থমকে দাঁড়িয়েই পেছনে ছুটল।

পেছনেরও পথ আটকে আবার কে হেসে উঠেছে, "হা-হা-হা!"

তারপর চারিদিক থেকে হাসির শব্দ, হ্যা-হ্যা-হ্যা, হো-হো-হো, হি-হি-হি। অন্ধকার সুড়ঙ্গটা বিকট হাসির শব্দে কেঁপে উঠছে। অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। কোনদিকে পালালে নিস্তার পাবে তাও ঠাওর করতে পারলে না বাজনা। তবু পেছন দিকেই ছুট মারলে। সঙ্গে সঙ্গে ধাঁই করে এক ধাক্কা দেওয়ালে। ছিটকে পড়ে গেল বাজনা মাটির ওপর। ঠিক তক্ষুনি ভাঁটার মত চোখ বার করে কারা যেন এগিয়ে আসছে বাজনার দিকে! কী বিচ্ছিরি হিংসুটে চোখগুলো!

চেঁচিয়ে কেঁদে ফেললে বাজনা!

যত কাঁদছে, চেঁচাচ্ছে, তারাও ততই হাসছে, হ্যা-হ্যা-হ্যা, হো-হো-হো!

মনে হচ্ছে বাজনার গলাটা তারা টিপে ধরবে এখুনি! এখুনি ওকে গিলে খেয়ে ফেলবে!

না, হঠাৎ নূপুর বেজে উঠল, ঝুন-ঝুন-ঝুন। কে যেন নূপুর পায়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে! অন্ধকারে কার পায়ে নূপুর বাজে!

সেই ভয়ঙ্কর হাসির শব্দ দেখতে দেখতে চটপট থেমে গেল। সেই হিংসুটে চোখগুলো ঝুপঝাপ বুজে গেল। সেই পাঁচটা না ছটা, ছটা না দশটা মুখ অন্ধকারে চুপচাপ লুকিয়ে পড়ল।

ঝুন-ঝুন-ঝুন, নূপুরের সুর কার পায়ে বেজে বেজে বাজনারই দিকে এগিয়ে আসছে? হাতে তার লণ্ঠন। অন্ধকারে যেন

জোনাকি! আলো দুলছে তার হাতে। দুলতে দুলতে কাঁপছে আলোর শিখা। নিভতে নিভতেও জ্বলে উঠছে। কে আসছে?

বাজনারই সামনে এসে দাঁড়াল। লণ্ঠনের আলো তার মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। বাজনা স্পষ্ট দেখতে পেলে তার সামনে দাঁড়াল একটি মেয়ে! ফুটফুটে! তার চেয়ে অনেক বড়। হাতের লণ্ঠনটি নিচু করে বাজনার চোখের দিকে তাকাল মেয়েটি। কথা বলল না। বাজনার হাতের দিকে নিজের হাতটি বাড়িয়ে দিল। বাজনা মেয়েটির হাত ধরে হতভম্বের মত উঠে দাঁড়াল। মেয়েটি হাঁটা দিল। বাজনাও তার হাতে হাত রেখে বোবার মত হেঁটে চলল।

খানিকটা এসেই দাঁড়াল মেয়েটি। বাজনাও দাঁড়াল। বাজনা লণ্ঠনের ছায়া-ছায়া আলোয় স্পষ্ট দেখলে সামনে একটা ফটক। মস্ত বড়। একজন লোক দাঁড়িয়ে। বিকট চেহারা। বোধ হয় দ্বারী। দ্বারী তার কোমর থেকে একগোছা চাবি বার করলে। ফটকের তালা খুলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে ক'জন তাগড়াই-তাগড়াই লোক এসে ফটকের দরজায় ঠেলা মারলে, "হেঁইও মারি জোয়ান ঠেলা।" ফটকের দরজা খুলে গেল।

হাত ধরেই বাজনাকে নিয়ে চলল মেয়েটি ফটকের মধ্যে। আবছা-আবছা আলো, তাই বাজনা বুঝতে পারল না কোথা যাচ্ছে! কোথা দিয়ে হাঁটছে ও? এটা ঘর, না দালান, মাঠ, না উঠোন? বোঝাই যায় না। কতদূর যেতে হবে?

আর বেশি দূর যেতে হল না। এবার একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। ঘরে তালা ঝোলানো। এবারও আর একজন চাবি দিয়ে চটপট তালা খুলে ফেলল। বাজনার হাতটি ধরে ঘরে ঢুকে গেল মেয়েটি।

একটু পরেই বেরিয়ে এল মেয়েটি।

কিন্তু একী! তার হাতটি ধরে বাজনা তো বেরিয়ে এল না! কোথা গেল বাজনা? ও আসবে না বাইরে?

না, ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আবার শেকলে তালা এঁটে গেল। বন্দী হয়ে রইল বাজনা এই ঘরে!

প্রথমটা মনে হয়েছিল খুব চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে বাজনা বন্দী-ঘরে। গায়ে যত জোর আছে সব দিয়ে ঘরের দরজাটা ভেঙে ফেলে চুর-চুর করে। না, ওর মুখ দিয়ে কথাই বেরুল না। ও যেন একেবারে হাঁদা হয়ে গেল! ভীষণ ভয়ে জবুথবুর মত থমথমিয়ে চেয়ে রইল বন্ধ দরজার দিকে! তবু রক্ষে, মেয়েটি তার হাতের লণ্ঠন বাজনার এই বন্দী-ঘরেই রেখে গেছে! তা না হলে এই ঘরে, অন্ধকারে গুমরে গুমরে তাকে রাত কাটাতে হতো। কিন্তু এখন কী করবে সে?

টাট্টুই প্রথম ডাকল, "বাজনা!"

বাজনা থতমত খেয়ে টাট্টুর মুখের দিকে চাইল। আশ্চর্য তো! এত কাণ্ড হয়ে গেল, কিন্তু টাট্টু বাজনার মুঠির মধ্যে তেমনিই গুটিসুটি লুকিয়ে আছে! আমি ভাবি, ও বুঝি কোথায় ছিটকে পড়েছে! তাই যদি হয়, কী হবে তখন? কে দেখবে তখন বাজনাকে?

টাট্টু আবার ডাকল, "বাজনা, কী ভাবছ?"

"এ কোথায় এলুম?" বাজনার গলায় কান্নার সুর।

টাট্টু বললে, "চুপ, কথা বল না।"

"আমার ভয় করছে। এরা যদি মারে?"

টাট্টু উত্তর দিলে, "ভয় পেলে চলে! উপায় একটা কিছু বার করতেই হবে। মনে মনে সাহস আনো, নইলে তোমার বিচ্ছিরি নামটা সুচ্ছিরি হবে কেমন করে?"

তাইতো!

বাজনা ভাবলে টাট্টু ঠিক বলেছে। তাই মনে মনে সাহস

আনলে। আনমনে চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে বন্দী-ঘরের এদিক ওদিক দেখতে লাগল। তেমন দেখার মত কিছুই নেই ঘরের ভেতর। একদিকে একটা চৌকি, বিছানা পাতা। আর একদিকে দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো একটা দেরাজ।

দেরাজ কেন?

বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "টাট্টু, ঘরে দেরাজ কেন?"

"দেখো না খুলে কিছু আছে কিনা!"

"দেখব?" বলে দেরাজটা খুলে ফেলল বাজনা।

না, দেরাজে কিচ্ছু নেই। আছে শুধু একটা শিলেট আর পেনসিল। তাছাড়া ভোঁ-ভাঁ!

শিলেটটাই হাতে নিল বাজনা। শিলেটে কী যেন লেখা! হ্যাঁ তো!

"টাট্টু, শিলেটে কীসব লেখা।" শিলেটটা হাতে নিয়েই বাজনা ছুটে গেল টাট্টুর কাছে।

টাট্টু বললে, "কী লেখা পড় না!"

শিলেটটা লণ্ঠনের কাছে নিচু করে ধরে বাজনা পড়ল :

"কাল সকালে তোমার বিচার হবে।"

লেখাটা পড়ে ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল বাজনার। জিজ্ঞেস করলে, "টাট্টু, কিসের বিচার?"

"বুঝতে পারছি না।"

"আমাকে মারবে?"

"মারতেও পারে, ছাড়তেও পারে।"

"চল পালিয়ে যাই।"

"পালাবে কী করে? ঘরে বন্দী করে রেখেছে যে!"

"হো-হো-হো!" হঠাৎ যেন বাইরে কে হেসে উঠল। হাসি শুনে আচমকা বাজনার হাত থেকে শিলেটটা পড়ে গেল ঘরের মেঝে, ঠঙ! ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ছুটে বিছানায় বসে পড়ল বাজনা চুপচাপ।

ভয় পাচ্ছে খুব। তেমনি ক্লান্তি। সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নি।

টাটু জিজ্ঞেস করলে, "বাজনা ভয় পাচ্ছে?"

বাজনা বললে, "ভয়ও পাচ্ছে, ক্লান্তিও লাগছে।"

"শুয়ে পড়।"

"না বাবা, যা কাণ্ডকারখানা। শুয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে তোমার সঙ্গে বসে বসে গল্প করি। কাল বরাতে কী আছে কে জানে!"

টাটু বললে, "না, কথাবার্তা বেশি না বলাই ভাল।"

"তবে বসে থাকি।"

বসে রইল বাজনা।

কতক্ষণ আর ঠুঁটো-জগন্নাথের মত বসে থাকা যায়! বাজনার চোখের পাতায় ঘুম আসছে জড়িয়ে জড়িয়ে। হাই উঠছে। জোর করে কী ঘুমের সঙ্গে আড়ি করা যায়! মাথাটা ঢুলে পড়ল বাজনার।

সঙ্গে সঙ্গে আবার বিচ্ছিরি হাসি, "হা-হা-হা।"

চমকে সিধে হয়ে বসল বাজনা। চোখ দুটো বড় বড় করে তাকাল। ঘরের মধ্যে কাউকেই দেখতে পেলে না। দরজা তো বন্ধ। ঘরে কে ঢুকবে! একী বাবা! ঘরে কেউ কোথাও নেই, অথচ হাসছে কে? উঠে দাঁড়াল বাজনা।

টাটু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে, "কোথা যাচ্ছ?"

"কোথাও না। পায়চারি করি।"

"কেন?"

"বিছানায় বসে থাকলে ঘুম পাচ্ছে।"

কথা শেষ না হতেই ঘরের দরজা খুলে গেল, ঝন-ঝন-ঝন ঝুন-ঝুন-ঝুন, নূপুর পরে সেই মেয়েটি আবার ঘরে ঢুকল। হাতে খাবারের থালা। বাজনার সামনে রেখে দিয়ে বললে, "খেয়ে নাও আমি তোমার মালতিদিদি। আমায় মনে রেখ।" বলে আবার নূপুর বাজিয়ে ফিরে গেল।

ঘরের দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

অবাক চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বাজনা। কী মিষ্টি গলার স্বর! আদর মাখা।

টাট্টু ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কী?"

"খাবার।"

"খেয়ে নাও।"

"না, ভাল লাগছে না।"

"খিদে পাচ্ছে না?"

"পাচ্ছে, কিন্তু খেতে ইচ্ছে করে কী!"

"খিদে যখন পাচ্ছে, তখন ভাল না লাগলেও খেয়ে নেওয়া ভাল। কাল কিছু জুটবে, কি না জুটবে কেউ জানে না তো।"

মনে মনে ভাবল বাজনা, হ্যাঁ, ঠিক কথাই। খেতে বসে গেল।

গরম ফুলকো-ফুলকো লুচি, আলুর দম, চাটনি, রসগোল্লা। চেঁচে-পুঁছে খেয়ে ফেললে বাজনা।

এবার সত্যিই বাজনার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। পেটে কিছু পড়লে ঘুম যেন বেশি বেশি পেয়ে বসে! তাই টাট্টুকে বললে, "বড্ড ঘুম পাচ্ছে।"

"শুয়ে পড়। আর শরীরকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই।"

"শুলেই যদি আবার কেউ হেসে ওঠে!"

"আমি জেগে আছি, তুমি শুয়ে পড়। খেলনা-পুতুলের তো আর ঘুম পায় না।"

সত্যি আর পারছিল না বাজনা। শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল।

রাতটা যে কখন এসেছে কে বুঝবে বল! অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে তো আর দিন-রাত কিচ্ছু বোঝা যায় না। সারাদিন হেঁটেছে, ছুটেছে, কত ঝক্কি গেছে মাথার ওপর দিয়ে। এখন একদম কাহিল।

সকাল কখন হল, বাজনা জানতে পারল না। পাখি ডাকে নি তো! সুড়ঙ্গের মধ্যে পাখি আসবে কোথা থেকে! ডাকবে কেমন করে?

পাখি ডাকল না, কিন্তু টাট্টু ডাকল, "বাজনা!"

নিঃসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছিল বাজনা। টাট্টুর ডাক শুনতেই পেল না।

আবার ডাকল টাট্টু, "বাজনা, বাজনা, উঠে পড়।"

এবার শুনতে পেয়েছে। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ল। অবাক চোখে চাইল টাট্টুর দিকে।

টাট্টু বললে, "সকাল হয়ে গেছে।"

"হয়ে গেছে!" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে বাজনা।

"হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে।"

ফস। একী হঠাৎ লণ্ঠনটা আপনা-আপনি নিভে গেল কেন? আবার অন্ধকার।

"টাট্টু, টাট্টু আলো নিভে গেল কেন?"

টাট্টু বললে, "বুঝতে পারছি না।"

"আমি তো কিচ্ছুই দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কোথায়?"

"বাঁদিকে। হাত বাড়াও।"

বাঁদিকে হাত বাড়িয়ে টাট্টুকে চেপে ধরল বাজনা।

ঠিক তক্ষুনি কি যেন একটা শব্দ ভেসে এল বাজনার কানে। ভেরির শব্দ। গুম গুম করে খুব দূর থেকে ভেরির শব্দ ভেসে আসছে। তালে তালে পায়ে চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে, খট-খট।

বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "টাট্টু, টাট্টু, মনে হচ্ছে কারা যেন এদিকেই আসছে!"

টাট্টু বললে, "হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে।"

সকাল হলেও ঘরের ভেতর কালো মিশমিশে অন্ধকার। গুম গুম শব্দে ঘরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাজনা থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শব্দটা এক্কেবারে যখন ঘরের কাছে এসে গেছে, তখন কান ঝালা-পালা হয়ে গেল বাজনার। সঙ্গে সঙ্গে দরজার শেকল বেজে উঠল, ঝন-ঝন-ঝন। খুলে গেল দরজা। এক ঝলক আলো ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। আলোর সঙ্গে তার সামনে দাঁড়াল এক বিকট চেহারার একজন পল্টন। পাকানো-পাকানো গোঁফ, একমুখ দাড়ি, আর রক্তজবার মত চোখ দুটো লাল-লাল। লাল-লাল চোখ দুটো ড্যাবডেবে করে বাজনার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হেঁড়ে গলায় ক্যার ক্যার করে চেঁচিয়ে উঠল, "তৈরি?"

বাজনা কি উত্তর দেবে, বুঝতে পারলে না।

লোকটা এবার আরও জোরে হেঁকে উঠল, "তৈরি?"

বাজনা হাঁদার মত চেয়ে রইল।

চেয়ে থাকতে হল না বাজনাকে বেশিক্ষণ। লোকটা হাঁক পাড়লে, "এই-হো-হো।"

অমনি খটাং খটাং করে দুটো পল্টন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাজনার কোমরে একটা দড়ি বাঁধলে। বাজনাকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে এল। তারপর টানতে টানতে নিয়ে চলল। বাজনা কাঁদতেও পারছে না. ডাকতেও পারছে না। বোবার মত চলেছে সে।

ঘরের বাইরে সুড়ঙ্গের এদিকটা বেশ আলো। দিনের আলো। আলো যে কোনদিক থেকে আসছে বোঝা যায় না। আলোয় চারি-

দিকটা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বাজনা। দুদিকের রাস্তাটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের ওদিকে কী আছে দেখা যায় না। সামনে যেখানে এসে দাঁড়াল বাজনা, সেখানেও একটা মস্ত পাঁচিল। একেবারে যেন আকাশ পর্যন্ত চলে গেছে। পাঁচিলের গায়ে একটা ফটক। পেল্লাই। লোহারই হবে হয়তো। পল্টনরা ফটকের সামনে দাঁড়াতেই খুলে গেল ফটকটা। ফটকের ভেতরে বড় বড় হরফে লেখা, "ছাগল-পাড়া"। বাজনা অনেক পাড়ার নাম শুনেছে, ঘোষপাড়া, বোসপাড়া, বাউনপাড়া, বাগ্দীপাড়া। কিন্তু "ছাগল-পাড়া"র নাম তো কখনও শোনে নি। তাই অবাক হয়ে ফটকের ভেতর ঢুকল বাজনা পল্টনদের সঙ্গে। ফটকের ভেতর ঢুকতেই হুস করে বাজনার চোখের ওপর এক ঝলক বাদামি রঙ ছড়িয়ে পড়ল। ওমা! একী! এতক্ষণ চারিদিক ঝলমলে আলো ছিল, হঠাৎ বাদামি হয়ে গেল কী করে! ভাবলে বুঝি চোখে কিছু পড়েছে। ভুল দেখছে। তাই বাজনা তাড়াতাড়ি নিজের চোখ দুটো মুছে নিলে। আবার ভাল করে চোখ মেলে এদিক ওদিক চাইল বাজনা। না, সত্যিই তো সব বাদামি! বাড়িগুলো ছোট-বড় বাদামি। পথ-ঘাট পাথরের বাদামি। পল্টন হেঁটে চলে, তারও রঙ বাদামি! তাইতো!

কিন্তু "ছাগল-পাড়া"য় ছাগল কই? এপাশে ছাগল নেই একটিও। ওপাশেও নেই। সামনেও নেই, পেছনেও নেই।

হঠাৎ পেছন ফিরতে গিয়ে, নিজের দিকে নজর পড়তেই বাজনার চক্ষু চড়কগাছ! এ ম্যা! ছিঃ! ছিঃ!

কী? কী?

বাজনার পেছনেতে ওটা কী?

কী? কী?

ছাগলের ল্যাজ না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ!

বাজনার সারা গায়ে ওটা কী?
কী? কী?
ছাগলের লোম না?
হ্যাঁ, হ্যাঁ!
বাজনার পায়ে আঁটা ওটা কী?
কী? কী?
ছাগলের খুর না?
হ্যাঁ, হ্যাঁ!
বাজনার মুখে ঝোলে কী ওটা?
কী ওটা?
ছাগলের দাড়ি না?

এ রাম! বাজনা যে ছাগল হয়ে গেছে! এতক্ষণ দড়িটা বাজনার কোমরে ছিল, এখন একেবারে গলায় উঠে গেছে! সেই দড়ি ধরে টেনে টেনে নিয়ে চলেছে পল্টনরা। বাজনা পেছনের দুটো ঠ্যাং দিয়ে হাঁটছে। আর সামনের দু ঠ্যাং ওপরে তুলে, টাট্টুকে ধরে আছে কোনরকমে।

বাজনার তো আক্কেল গুড়ুম! ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল, যাঃ চ্চলে! ব্যা-এ্যা-এ্যা করে ডেকে উঠল। আবার ভ্যাঁ করল, ব্যা-এ্যা-এ্যা করে ডেকে ফেলল।

কাঁচুমাচু হয়ে টাট্টুর দিকে চাইল বাজনা। ডাক দিল, "টাট্টু, টাট্টু, ব্যা-ব্যা!"

টাট্টু চুপিসাড়ে বললে, "চুপ চুপ।"

"আমি যে ছাগল হয়ে গেলুম! ব্যা-এ্যা-এ্যা!"

টাট্টু বললে, "ও কিছু নয়। সব ঠিক হয়ে যাবে। এগুলো সব অসুখের লক্ষণ! নামের অসুখ বড় সাংঘাতিক অসুখ!"

"তা বলে কী আমার নাম ছাগল হয়ে যাবে!"

"ভাল হয়ে গেলে দেখবে কিচ্ছু থাকবে না। তুমি যেমন ছিলে তেমনি হয়ে যাবে।"

ফটকের অনেকটা ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে বাজনা। এবার বাদামি রঙ একটু একটু ফিকে হয়ে এসেছে। এখন বাজনা ছাগলের চাউনি দিয়ে দেখল, সামনে আর একটা ফটক। ফটকের সামনে এসে পল্টনরা দাঁড়াতেই এই ফটকটাও খুলে গেল। বাজনার গলার দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই হোঁচট খেয়ে বাজনা ভেতরে ঢুকে পড়ল।

এ-ফটকের ভেতরেও রাস্তা আছে, বাড়ি আছে। অবিশ্যি "ছাগল-পাড়া"র মত কোন পাড়ার নাম লেখা নেই। তবু রক্ষে! এখানে আর রঙও নেই। একদম ঝকঝকে দিনের আলো! অনেক লোক রাস্তা-ঘাটে চলছে, ফিরছে। একটা ছাগলকে দুপায়ে হাঁটতে দেখে আর পল্টনরা তার গলায় দড়ি ধরে টানছে দেখে লোকগুলো হিহি করে হেসে দিল। লজ্জায় মরে যায় বাজনা!

পল্টনরা টানতে টানতে বাজনাকে একটা মস্ত বাড়ির সামনে হাজির করল।

এটা বাড়ি না তো!

তবে?

রাজপ্রাসাদ।

রাজপ্রাসাদের সামনে সিংদরজা। সিংদরজার দুপাশে দুটো হাতি শুঁড় দোলাচ্ছে। হাতির পিঠে দুপাশে দুই দ্বারী বসে আছে। ছাগল-ছাগল বাজনাকে দেখে হাতি দুটো কেমন খিলখিল করে হেসে উঠল। বাজনার ঠিক কানে গেছে! বাজনা হাতির খিলখিলানি শুনে আর নড়তে চায় না। কিছুতেই সিংদরজা ডিঙুবে না। পল্টনরাও ছাড়বে না। তারাও দড়িতে এই টান দেয় তো, এই টান দেয়। পল্টনরা যতই টানছে, বাজনাও ততই পেচুচ্ছে।

টাট্টু অমনি চট করে বাজনাকে বললে, "বাজনা, বাজনা, লড়াই করো না। ভেতরে চল।"

টাট্টুর কথা শুনে বাজনা আর টানা-হ্যাঁচড়া করল না। সিংদরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

একটু গিয়ে, ইয়া লম্বা চত্বর পেরুতেই একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল পল্টনরা। ঘরের ভেতর থেকে দুজন লোক এসে বাজনার গলার দড়িটা ধরে টান দিলে। বাজনা হুড়মুড় করে ভেতরে ছিটকে পড়ল।

ঘরে কেউ কোথাও নেই। একেবারে ফাঁকা। কী বিরাট ঘর। আর কী উঁচু। চারিদিকে মোটা মোটা থাম। শ্বেতপাথরের। থামের আড়াল দিয়ে চোখ মেলতেই বাজনার নজরে পড়ল একটা সিংহাসন! সিংহাসনের ওপর কে যেন বসে আছে? হ্যাঁ, ঠিক তাই।

আরি বাবা! সিংহাসনে কী অদ্ভুত চেহারার একটা জ্যান্ত জীব বসে আছে! মাথাটা খ্যাঁক-শেয়ালের মত অমনি লম্বা আর গোঁফ-ওয়ালা। শেয়ালের লম্বা মাথায় হাতির কান লটকানো। সারা গায়ে ভাল্লুকের মত লোম ঝুলে আছে। হাত-পাগুলো বাঘের থাবার মত অমনি বড়-বড় নোখে ভর্তি। আর কপালে কী চমৎকার ঝকমকে একটা টিপ পরেছে! দেখলেই মনে হয় খুব দামী হীরে বা চুনি-পান্নার তৈরি! টিপের আলো ঝিকমিক করতে করতে বাজনার মুখের ওপর পড়েছে।

চোখ পড়তেই বাজনা থমকে দাঁড়ায়। দেখেশুনে বাজনার যেন হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাচ্ছে! হঠাৎ এমন চেহারার একটা জ্যান্ত জন্তুর সামনে পড়লে অমন আচ্ছা আচ্ছা লোকের বুকের ধুকধুকি থেমে যায়, তো বাজনা কোন ছার। তার ওপর সে এখন মানুষই নয়। ছাগল। কিরে বাবা! বাজনাকে ছাগল বলে খেয়ে ফেলবে নাতো!

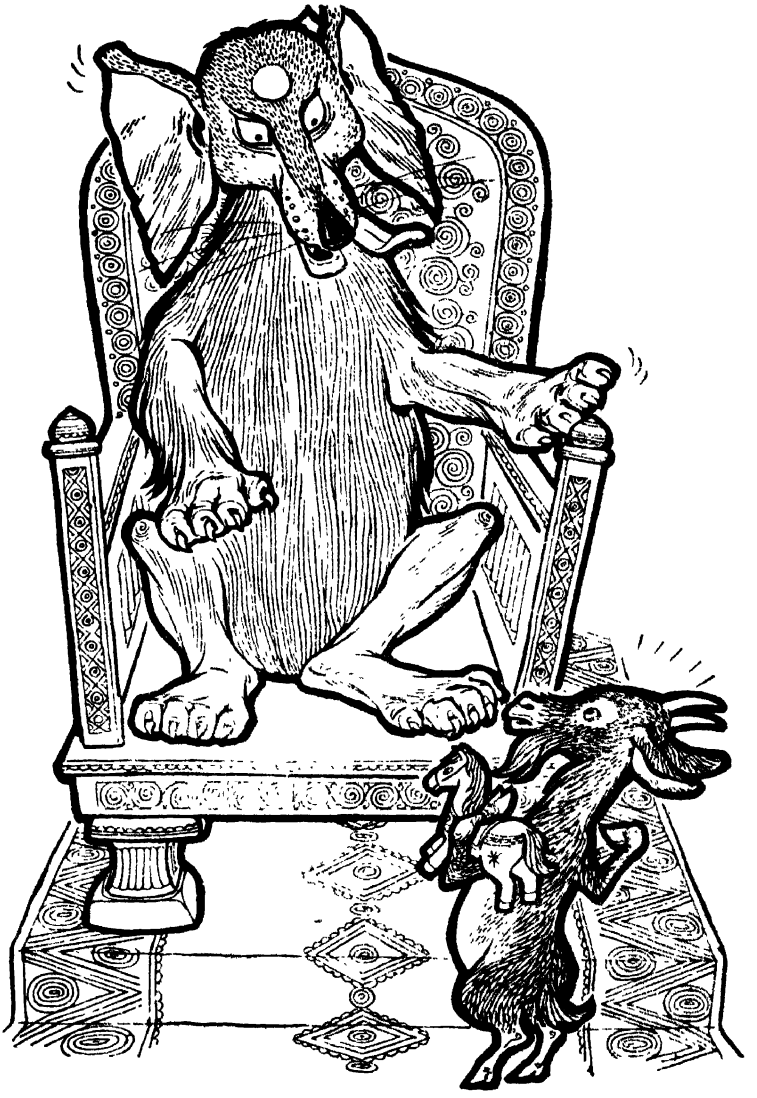

"খ্যাঁক-খ্যাঁক-খ্যাঁক," হঠাৎ হেসে উঠল জন্তুটা। গলাটা যাচ্ছেতাই রকমের খ্যান-খ্যানে আর সরু মত। অমন চেহারার এমনি সরু গলা শুনে অনেকটা অবাক হয়ে চেয়ে রইল বাজনা তার দিকে।

"অমন করে কী দেখছিস?" জন্তুটা সরু গলায় কথা বললে। "ইদিকে আয়।"

বাজনা নড়ল না।

ধমক দিল জন্তুটা, "কিরে, কথা কানে সেঁদুচ্ছে না? এক্ষুনি ঘাড় মটকে পিণ্ডি চটকে দেব। আয় ইদিকে।"

বাজনা সুড়সুড় করে ভয়ে ভয়ে ক' পা এগিয়ে গেল।

"আমাকে চিনিস?" জন্তুটা বাজনাকে জিজ্ঞেস করলে।

বাজনা তবুও ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

"কিরে, কথা বলছিস না কেন? আমাকে চিনিস?" আবার ধমকে উঠল।

বাজনা চমকে উঠে ঘাড় নাড়লে।

"চিনিস না? আমি এদেশের রাজা। আমার নাম চক্কুর চ্যাং-চ্যাং। তোর নাম কী?"

বাজনা এবার শুকনো গলায় উত্তর দিলে, "আজ্ঞে, আমার নাম বাজনা, এখন ছাগল।"

আবার "খ্যাঁক-খ্যাঁক-খ্যাঁক" করে জন্তুটা হেসে উঠল। "বেড়ে নামটা তো! বাজনা! এখানে এসেছিস কেন?"

বাজনা ভয়ে জুজুর মত কুঁচকে উত্তর দিলে, "আজ্ঞে, এখানে তো আসতে চাই নি। আমার নামটা বিচ্ছিরি। তাই একটা ভাল নাম খুঁজতে বেরিয়েছি। খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়েছি।"

"ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাচ্ছিস?" চক্কুর চ্যাং-চ্যাং জিজ্ঞেস করলে রাগ-রাগ গলায়।

বাজনা চট করে কান পাততেই শুনতে পেলে ঘণ্টার শব্দ।

তাই তো! ঘণ্টাটা এখনও বাজছে! এতক্ষণ নানান ঝামেলায় ঘণ্টার শব্দটা কানেই আসে নি তার!

"কিরে শুনতে পাচ্ছিস?" আবার কড়কে উঠল চক্কুর চ্যাং-চ্যাং!

বাজনা থতমত খেয়ে বললে, "হুঁ হুঁ পাচ্ছি।"

"তুই ঐ ঘণ্টাটা বাজিয়েছিস?"

"হ্যাঁ।"

"দুষ্টু ছেলেরা ঐ ঘণ্টা বাজালে ও আর থামে না। যে দুষ্টু ছেলে ঐ ঘণ্টা বাজিয়েছে, সে লক্ষ্মী না হলে ঐ ঘণ্টা বাজবেই। তুই একটা হতচ্ছাড়া দুষ্টু ছেলে।"

"আজ্ঞে আমি তো আর ছেলে নই, আমি ছাগল হয়ে গেছি।"

বাজনার কথা শুনে অত রাগেও চ্যাং-চ্যাং রাজা খ্যান-খ্যান করে আবার হেসে উঠল। হেসেই আবার গম্ভীর হয়ে বললে, "তার মানে তুই পাজির পা-ঝাড়া। আরও কিছু অন্যায় করেছিস। শুধুমুধু তো আর কেউ ছাগল হয় না।"

"আমি আর তো কিছু করি নি।"

"করেছিস, কী করিস নি পরে জানা যাবে। এখন তোকে ঐ ঘণ্টা থামাতে হবে। নইলে তোর ঘাড় মটকে আমি পেটপুজো করব।"

বাজনা কেঁদে ফেলার যোগাড়। কাঁদো-কাঁদো সুরে বললে, "আজ্ঞে, আমায় মানুষ না করে দিলে, আমি ঘণ্টা থামাব কী করে?"

"সে কথা আমি জানি না। মানুষ হব বললেই হওয়া যায় না। এখন তোকে "বাঁদর-পাড়া"য় যেতে হবে। ছাগল থেকে তুই যদি বাঁদর হয়ে যাস, তা হলে বুঝতে হবে আরও কিছু অন্যায় করেছিস। তোর হাতে ওটা কী?" রাজার হঠাৎ বাজনার সামনের ঠ্যাং-এর দিকে নজর পড়ল। ঠ্যাং-এ টাট্টুকে ধরে রেখেছে বাজনা।

বাজনার তো পিলে চমকে ওঠে। বললে, "আজ্ঞে, এটা আমার

খেলনা ঘোড়া, কাঠের টাট্টু।"

"ওটা আমার কাছে রেখে যা।"

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল বাজনা, "না-আ-আ।"

"না বললেই ছাড়ছে কে! দে, নইলে গলা টিপে মেরে ফেলব।"

আরও চেঁচিয়ে উঠল বাজনা, "না, আমি দেব না। কিছুতেই না।"

"এই, কে আছিস!" ডাক দিল চক্কুর চ্যাং-চ্যাং।

একজন পল্টন ছুটে এল।

"ওর কাছ থেকে ঐ কাঠের ঘোড়াটা কেড়ে নে।" গম্ভীর গলায় হুকুম দিল চ্যাং-চ্যাং।

পল্টন কেড়ে নিতে গেল। বাজনা "না দেব না, না, না, দেব না" বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে লাফাতে লাগল। পল্টন তাই না দেখে মারল বাজনার পিঠে চাবুক, সপাং সপাং। বাজনা লাফাতে লাফাতে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। হাত থেকে ছিটকে পড়ল টাট্টু।

"দে, ঘোড়াটা আমায় দে।"

পল্টন চক্কুর চ্যাং-চ্যাং-এর হাতে ঘোড়াটা দিল।

চক্কুর চ্যাং-চ্যাং ঘোড়াটা হাতে নিয়ে চোখ পাকিয়ে বললে, "যা, এবার ওকে "বাঁদর-পাড়া"য় নিয়ে যা। তিনদিনের মধ্যে ঘণ্টা না থামলে, ওকে আবার আমার কাছে নিয়ে আসবি। তারপর যা করার আমি করব!"

রাজার হুকুম শুনেই পল্টন বাজনার গলার দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল বাইরে। বাজনার গলায় যত টান পড়ে, ও ততই "উঃ-আঃ" করে গোঙাতে থাকে। গোঙানি শুনে এদিক ওদিক থেকে লোক জমে যায়! বাজনাকে দেখে, কেউ ফিকফিক করে হাসে। কেউ ফ্যাকফ্যাক করে হাসে। কেউ হ্যা-হ্যা করে হাসে। চারিদিকে হাসি। অপমানে লজ্জায় মরে যায় বাজনা। বাজনা গোঙানি থামিয়ে, মুখ

নিচু করে গুটিগুটি হাঁটা দিলে।

রাজবাড়ির সিংদরজা পেরিয়ে গেল। বাজনা রাস্তায় পড়ল। এতক্ষণ টাট্টু সঙ্গে ছিল, সাহস ছিল। এখন সে কার সঙ্গে কথা বলবে? ভয়ে মুখ তার এইটুকুনি, আমসি! কাঁদতেও পারছে না, ভাবতেও পারছে না।

একটু পরেই "বাঁদর-পাড়া"র ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল পল্টন। বুকটা কাঁপতে লাগল বাজনার। মনে মনে বললে, "হে ভগবান, ছাগল করেছ তা-ও ভাল, বাঁদর করো না যেন! তাহলে মুখ দেখাব কেমন করে!"

ফটক খুলে গেল। এক ঝলক বাঁদুরে রঙ হুস করে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। বাজনার চোখ দুটো ধাঁধিয়ে গেল। এগিয়ে চলেছে বাজনা। চারিদিকে শুধু রঙ আর রঙ, বাঁদুরে রঙ। আর কেউ নেই, কিচ্ছু নেই।

হঠাৎ বাজনার ছাগল-ছাগল ল্যাজটা কেমন সুড়সুড় করে উঠল। বাজনা পেছন ফিরে ল্যাজের দিকে তাকালে। চমকে উঠল বাজনা।

কেন?

আরে! আরে! ছাগলের ল্যাজটা তো নেই আর!

ছাগলের ল্যাজ না তো ওটা কিসের ল্যাজ?

ওটা তো বাঁদরের ল্যাজ!

কই দেখি দেখি!

তাই তো!

ছাগলের ল্যাজ নেই, বাঁদরের ল্যাজ ঝুলছে বাজনার পেছনে।

যাঃ! নিজের দিকে তাকিয়ে বাজনা হকচকিয়ে গেল। ঠিক যা ভেবেছে তাই!

তার গায়ে বাঁদরের লোম!

তার পায়ে বাঁদরের নোখ!

তার মুখে বাঁদরের মুখ!

ইস! ছাগল-ছাগল বাজনা এবার সত্যি সত্যি বাঁদর হয়ে গেল! বাজনা হাউ-হাউ করে কান্না জুড়ে দিলে। ওমা! কাঁদতে কাঁদতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আবার পল্টন হিড়-হিড় করে টান দিলে। লেগেছে, বাজনার গলায় ভীষণ লেগেছে! চলতে সুরু করে দিলে।

"বাঁদর-পাড়া"র মাঝ-বরাবর এসে, পল্টন একটা মস্ত বড় খাঁচার সামনে দাঁড়াল। কেন? খাঁচার দরজা খুলে পল্টন বাজনাকে খাঁচার মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলে। গলার দড়িটা খাঁচার সঙ্গে বেঁধে বাজনার পায়ে একটা লোহার শেকল পরিয়ে দিল। আবার দরজাটা এঁটে দিল জোরসে। যেন পালাতে না পারে। তারপর পল্টন খাঁচার ভেতর হাত গলিয়ে বাজনার গালে একটা টুসকি মেরে বললে, "যতদিন না লক্ষ্মী হচ্ছ, ততদিন বাঁদর হয়ে খাঁচার মধ্যে থাকছ।" বলে গটমট করে চলে গেল।

বাজনা পল্টনকে চলে যেতে দেখে হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠল, "আমায় ছেড়ে দাও।" কাঁদতে কাঁদতে খাঁচার মধ্যে মাথা খুঁড়তে লাগল।

কতক্ষণ কাঁদল বাজনা কে জানে! এখন তার নাম পাল্টানো দূরে থাক, উল্টে বিচ্ছিরি নামটা আরও বিচ্ছিরি হয়ে গেল। এখন তার নাম বাঁদর! ছিঃ! ছিঃ! ভাবতেই গা শিউরে উঠছে। এখন যে কী করবে বাজনা? টাটুও নেই যে তার সঙ্গে দুটো কথা বলবে! যেমনকে তেমন, থাকো খাঁচায় বন্দী হয়ে! পালাবে তারও উপায় নেই! পায়ে শেকল বাঁধা।

বাজনা ভাবতে ভাবতে শুচ্ছে।

শুতে শুতে বসছে।

বসছে আবার কাঁদছে।

এমনি ছটফট করতে করতে বাজনার ঘুম এসে গেল। ঘুম যত পাচ্ছে, ভয়ও পাচ্ছে তত। কাছেভিতে কেউ কোথাও নেই। খাঁ খাঁ করছে চারিদিকটা। তাই, না শুয়ে বসে বসে ঢুলতে লাগল। আর খাঁচায় মাথা ঠুকতে লাগল।

একবার মাথাটা খুব জোরে ঠুকে গেছে, "উঃ হু হু!" চমকে চাইল বাজনা। থমকে গেল মনটা। কে যেন নূপুর পায়ে এগিয়ে আসছে, ঝুন-ঝুন-ঝুন! খুঁজতে লাগল বাজনার চোখ দুটি এদিক ওদিক। শুনতে লাগল কান পেতে।

বাজনার ভয় লাগছে, আবার সাহসও আসছে। "বাঁদর-পাড়া"র বাঁদুরে রঙটা নূপুরের সুরে সুরে কেমন একটু একটু ফিকে হয়ে আসছে! ধীরে ধীরে বাঁদুরে রঙ সরে গিয়ে হালকা নীল রঙের একটা পর্দা ছড়িয়ে গেল চারিদিকে! নূপুরের সুরে আর রঙের বাহারে এত বিপদেও যেন বাজনার ভাল লাগছিল!

"বাজনা!" কে ডাকল?

ঝট করে পেছন ফিরে তাকাল বাজনা। আরে! সেই মেয়েটি না! মালতি! আঃ! তাকে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল বাজনার। সেদিন অন্ধকারে ভাল করে দেখতে পায় নি বাজনা। বুঝতে পারে নি এত মিষ্টি দেখতে তাকে। ফিকে নীল আলোয় তার ফিকে নীল শাড়ি; চুমকি আঁটা। ঝিকমিক করছে। হাতে খাবারের থালা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

"বাজনা!" আবার ডাকল। "আমায় চিনতে পারছ? আমি মালতিদিদি।"

বাজনা উত্তর দিতে পারল না। থির-দিষ্টিতে দেখতে লাগল।

"কী দেখছ? কিছু বলছ না?"

সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিল বাজনা। লজ্জায় মুখ নিচু করে রইল। ছিঃ! কেমন করে কথা বলবে সে অমন একটি মেয়ের সঙ্গে!

"বাজনা, সাড়া দিচ্ছ না যে?"

বাজনা এবার মুখ তুলল। জিজ্ঞেস করলে, "তুমি আমার নাম জানলে কী করে?"

"তোমার নাম এখানে সক্কলেই জানে।"

কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল বাজনা মেয়েটির কথা শুনে। সবাই তার বিচ্ছিরি নামটা জেনে ফেলেছে! মুখখানা অভিমানে ফুলে উঠল বাজনার। বললে, "আমি তো আর বাজনা নই, আমি তো বাঁদর!" বাজনার চোখ দুটো ছলছল।

"হি-হি-হি", হেসে উঠল মেয়েটি।

ছি-ছি করে উঠল বাজনার মনটা।

"তোমার খিদে পায় নি? খাবার এনেছি। খাবে না?" জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

"খিদে নেই।" রেগেমেগে উত্তর দিল বাজনা।

"খিদে নেই, না রাগ হয়েছে?"

রাগই তো হয়েছে! কার না রাগ হয় বল? বাজনা মানুষ ছিল হঠাৎ ছাগল হয়ে গেল! ছাগল হল সে না হয় এক কথা, এখন আবার বাঁদর হয়ে গেছে! খাঁচায় বেঁধে রেখেছে! কী কান্ড! নাম পাল্টাতে এসে গোটা মানুষটাই পাল্টে গেল! পাল্টাল পাল্টাল শেষে কিনা বাঁদর! কত বড় ল্যাজ দেখদিকিনি! ছিঃ! ছিঃ! কেমন করে মুখ দেখাবে সে! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল বাজনা।

খাঁচার মধ্যে হাত পুরে দিল মেয়েটি। বাজনার মাথায় হাত দিল। আদর করে জিজ্ঞেস করল "কাঁদছ?"

বাজনার হঠাৎ মনে হল, ও যেন মেয়েটির পোষা বাঁদর? তেমনি করে আদর করছে। মাথাটা চটপট সরিয়ে নিল বাজনা। চেঁচিয়ে

উঠল, "না, না, আমি কাঁদি নি। আর কাঁদছি কি, না কাঁদছি সে তোমায় দেখতে হবে না।" বলে ল্যাজটা গুটিয়ে নিল বাজনা।

মেয়েটির অমন হাসি-হাসি মুখখানি ফস করে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, "বেশ, দেখছি না। খাবারটা রেখে দিয়ে যাচ্ছি। খেতে হয় খেও, না হয় ফেলে দিও।"

খাবারের থালাটা খাঁচার ভেতর রেখে দিল। ওমা! কলা!

"আমি যাচ্ছি।" হাঁটা দিল মেয়েটি। পায়ের নূপুর বেজে উঠল।

তবু মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল বাজনা। একবারটিও চোখ তুলে চেয়ে দেখলে না। কতদূর চলে গেল মেয়েটি জানে না বাজনা। শুধু শুনছে নূপুরের শব্দ ভেসে ভেসে দূরে দূরে হারিয়ে যাচ্ছে, ঝুন-ঝুন। আর সব নিঃঝুম! ফাঁকা। একা বাজনা বসে আছে খাঁচার মধ্যে। কতদিন যে বন্দী হয়ে বসে থাকতে হবে, কে জানে! তিনদিনের মধ্যে ঘণ্টা না থামলে হয়তো চিরদিনই বাঁদর হয়ে থাকতে হবে! সব্বাই ঘেন্না করবে বাজনাকে। ছ্যা! ছ্যা!

কিন্তু না, না। মেয়েটি তো তাকে ঘেন্না করল না। বাজনার হঠাৎ যেন মনে হচ্ছে, এখনও মেয়েটির হাতের ছোঁয়া তার কপালে লেগে রয়েছে। আঃ! মিষ্টি মিষ্টি আদর মাখানো হাতখানি! ছিঃ! ছিঃ! বাজনা মিছিমিছি তার ওপর রাগ করলে! মেয়েটির কী দোষ! খেয়ে নিলেই হতো কলাগুলো!

মেয়েটির পায়ের নূপুর এখনও বাজছে, ঝুন-ঝুন। অনেক দূরে!

বাজনার বুকটা কেঁদে উঠল। মনে হল নিজের জিনিস কাছে পেয়েও সে হারিয়ে ফেলল। আহা রে! মেয়েটি হয়তো তার ভালর জন্যেই এসেছিল। হয়তো সে বলে দিতে পারত কেমন করে ঘণ্টা থামাতে হবে। কেমন করে সে আবার মানুষ হবে। এতদিন টাট্টু

ছিল, সাহসও ছিল। এখন আপনজন আর কেউ নেই তার! মেয়েটি এল, তার সঙ্গেও আড়ি হয়ে গেল বাজনার। কী হবে?

এখনও মেয়েটির পায়ের নূপুর শোনা যাচ্ছে। খুব অস্পষ্ট!

বাজনা চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ। ডাক দিল মেয়েটিকে, "শোন-ও-ও।"

সাড়া পেল না।

আরও জোরে ডাকল, "শোন-ও-ও-ও।"

তবুও না।

নূপুরের ঝুন-ঝুন সুরটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। কেঁদে উঠল বাজনা ডুকরে ডুকরে। কাঁদলে এখন আর কে শুনছে? যেমনকে তেমন!

অনেকক্ষণ কেঁদেছিল। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল বাজনা খাঁচার ভেতর। খাওয়া আর হল না তার।

অবাক হয়ে গেল বাজনা ঘুম ভাঙতেই। আরে! তার খাঁচাটা যেন দুলে দুলে হেঁটে হেঁটে চলেছে!

হ্যাঁ, সত্যিই চলেছে। তবে নিজে নিজে হাঁটছে না খাঁচাটা। একটা হাতির পিঠে খাঁচাটা তোলা হয়েছে। খাঁচার ভেতর ঠিক আগে যেমন ছিল তেমনিই বাজনা বন্দী। হাতি হেঁটে চলেছে, বাজনার খাঁচাও দুলে দুলে এগিয়ে চলেছে। তালে তালে ডুগডুগি বাজছে, ডুগডুগ, ডুগডুগ।

একী ব্যাপার! তড়বড় করে উঠে পড়ল বাজনা। ঘুম-ছোঁয়া চোখ দুটো খুব ভাল করে রগড়ে নিলে। উরি বাবা! রাস্তা থেকে কত ওপরে উঠেছে সে! কত লোক এদিক ওদিক, তাকে দেখছে, হৈ হৈ করছে! কিচ্ছু বুঝতে পারছে না বাজনা। ইস! কী ভীষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল বাজনা! এত কাণ্ড হয়ে গেল, কিছুই জানতে

পারে নি! নাই জানুক। কিন্তু হাতির পিঠে চেপে সে যাচ্ছে কোথায়?

হঠাৎ সামনের দিকে একটা কাপড়ের ওপর নজর পড়ল। কী যেন বড় বড় করে লেখা কাপড়টার ওপর! হ্যাঁ। লেখা আছে:

"এটি আসলে বাঁদর নয়। একটি দুষ্টু ছেলে। দুষ্টুমি করতে করতে প্রথমে ছাগল হয়ে যায়। তারপর বাঁদরামি করতে করতে এখন বাঁদর হয়ে গেছে। সকলকে দেখাবার জন্যে একে সহর ঘোরানো হচ্ছে।"

লেখাটা পড়ে বাজনার মনে হল, এখনই সে হাতির পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে। কিন্তু লাফাবে কী, খাঁচায় তো সে বন্দী! শেকল দিয়ে পা বাঁধা। তার ওপর চারিদিকে লোকজন, হৈহৈ! হাসছে, হাততালি দিচ্ছে, ছ্যাছ্যা করছে।

এ-বাড়িতে লোক। ও-বাড়িতে লোক। রাস্তায় লোক। ছাতে লোক। গলিতে লোক। কেউ জিভ ভ্যাংচাচ্ছে। কেউ বুড়ো আঙুলে কলা দেখাচ্ছে। কেউ বক দেখাচ্ছে। বাজনা মাথা হেঁট করে বসে আছে!

ওমা! ল্যাজটা কখন খাঁচার ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়েছে! খেয়াল নেই তো বাজনার। আর কী, একটা ছোট্ট ছেলে দেখতে পেয়েছে! হাত বাড়িয়ে নাগালও পেয়ে গেল। আর দেখতে হয়! দিয়েছে টান! বাজনা "কিঁক" করে চেঁচিয়ে উঠেছে। আর তখন চারিদিকে কী হাসির হুল্লোড়!

তাড়াতাড়ি ল্যাজটা গুটিয়ে নিল বাজনা। ভাবলে, খাঁচায় যদি বাঁধা না থাকত, তো দেখে নিত ছেলেটাকে। পিঠে এমন গুম করে কিল বসাতো যে বাছাধনকে আর ট্যাঁ-ফুঁ করতে হতো না। অগত্যা বাজনা ল্যাজটা গুটিয়ে, সামনের পা দিয়ে নিজের মুখটা ঢেকে রাখলে।

ঢাকলেই কী নিস্তার! অমনি রাস্তার লোকগুলো চেঁচিয়ে উঠল, "মুখ ঢেকেছে, মুখ ঢেকেছে।" মাহুতটা সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার মধ্যে হাত পুরে বাজনার কানটা নেড়ে দিলে। সবাই আবার হেসে উঠল। বাজনা তাড়াতাড়ি মুখ থেকে আড়াল সরিয়ে নিল!

সারা সহরটাই ঘুরল বাজনা হাতির পিঠে। সারা সহরে ঢি ঢি পড়ে গেল!

যেখানে ছিল আবার সেই "বাঁদর-পাড়াতে"ই ফিরে এল বাজনা। আবার সেই খাঁচাতেই বন্দী হয়ে পড়ে রইল। সামনে কলাগুলো যেমন ছিল তেমনিই পড়ে আছে। খায় নি। খিদে পাচ্ছে না। এর পরেও আর কারো খিদে পায়! লজ্জার একশেষ! এ-ও বাজনার কপালে ছিল! বরাতে আরও কী আছে, কে জানে!

সারাক্ষণ নিঃশ্চুপ একা একা বসে রইল বাজনা খাঁচায়। কী বিচ্ছিরি লাগছে! কথা বলার তো কেউ নেই। বাইরে বেরুবে তারও উপায় নেই। বেরুলেই বা কী! কোথা যাবে সে একা একা? চারিদিকে পাহারাদার। ওদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া কী সহজ কাজ! কিন্তু খাঁচায় বাঁধা থাকলেই বা সে কী করে ঘণ্টা থামাবে? হ্যাঁ, ঐতো ঘণ্টা এখনও বাজছে। শুনতে পাচ্ছে বাজনা। আর ভাবতে পারছে না বাজনা কিচ্ছু! শুধু একটা কথাই তার মনের মধ্যে বার বার জানান দিচ্ছে, দুষ্টুমি করলে মানুষ বাঁদর হয়ে যায়! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার এ কথাও ভাবছে, আচ্ছা, বাঁদরের মধ্যেও কী সবাই দুষ্টু! বাঁদর বুঝি লক্ষ্মী হয় না!

"ঝুন-ঝুন-ঝুন!" হঠাৎ যেন আবার নূপুর বেজে উঠেছে।

চমকে চাইল বাজনা।

"ঝুন-ঝুন-ঝুন।" হ্যাঁ, সত্যিই নূপুর বেজেছে।

তাকিয়ে রইল বাজনা সামনে।

বাঁদুরে রঙটা এদিকে, ওদিক আবার ফিকে ফিকে নীল হয়ে গেল।

ফিকে ফিকে নীল রঙটা কেমন মিষ্টি! বাজনার মনটা কেন জানি খুশি-খুশি হয়ে উঠছে।

কে আসছে?

সেই মেয়েটি না?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। মালতি।

না, আর বাজনা ভুল করবে না। এবার ঠিক ওর সঙ্গে ভাব করবে।

মেয়েটি আবার বাজনার সামনেই এসে দাঁড়াল।

বাজনা মাথা হেঁট করলে।

"বাজনা!" ডাক দিল মেয়েটি। আবার ঠিক তেমনি আদর-মাখা সুর।

বাজনা মেয়েটির চোখের দিকে চাইল। চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে বাজনার।

"বাজনা, খাও নি?" মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে।

"তুমি কেন চলে গেলে?" আচমকাই জিজ্ঞেস করল বাজনা।

"যাব না! তুমি আমার ওপর রাগ করলে যে।"

"তোমরা আমায় বাঁদর করে রেখেছ, আমার রাগ হবে না!"

"কে বললে তুমি বাঁদর, তুমি তো বাজনা।"

"বারে! আমি যখন বাজনা ছিলুম, আমার চেহারা কী এমনি ছিল? এই দেখো না আমার হাত-পাগুলো বাঁদরের মত। সারা গায়ে আমার বিচ্ছিরি বাঁদুরে লোম। আমি তো আগে এরকম ছিলুম না!"

"তুমি এখন যাই হও না কেন তোমার নামটা তো ঠিকই আছে।"

"বাঁদরের নাম আবার বাজনা হয়?"

"তা হলে তোমার নামটা ভাল। বাঁদরের চেহারাটা বিচ্ছিরি!"

"না, দুটোই বিচ্ছিরি! আমার দুটোই চাই না।"

"বাজনা!" আবার আদর করে ডাকল মেয়েটি।

বাজনা কথা বলতে বলতে থামল।

"খেয়ে নাও।"

"ইচ্ছে করছে না।"

"খাওয়ার ওপর রাগ করতে নেই, ঠকতে হয়।"

"ইচ্ছে করে কেউ রাগ করে? সারাদিন ধরে সকলের সামনে আমায় অপমান করলে। সহরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমার চেহারাটা সবাইকে দেখিয়ে বেড়ালে। আমার রাগ হবে না?" কেঁদে ফেলল বাজনা।

খাঁচার মধ্যে হাত পুরে দিল মেয়েটি। বাজনার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। মুছে দিল। বাজনার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, "কেঁদো না, খেয়ে নাও। দুষ্টুমি না করলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"বল, আমার পায়ের শেকল খুলে দেবে?" জিজ্ঞেস করল বাজনা।

"দুষ্টুমি যদি না কর, আমার কথা শোন, তবে খুলে দেব।"

"বলছি তো আমি লক্ষ্মী হব। লক্ষ্মী তো আমায় হতেই হবে, নইলে তো বাঁদরই থেকে যাব।"

"বেশ আমি তোমায় খুলে দিচ্ছি।" বলে মেয়েটি খাঁচার দরজা খুলে দিল। বাজনার পায়ের শেকল সরিয়ে রাখল। বাজনা বাইরে বেরিয়ে এল।

"এবার খেয়ে নাও?" মেয়েটি একটি কলা তুলে দিল বাজনার হাতে। বাজনা খেয়ে ফেলল, একটি, দুটি, তিনটি, চারটি কলা। তারপর মেয়েটির হাত দুটি জড়িয়ে ধরলে। জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কে?"

"যারা তোমার মত দুষ্টু, তাদের আমি বন্ধু। আমি তোমার মালতিদিদি। দুষ্টুদের লক্ষ্মী করার কাজ আমার।"

"তুমি চলে গেলে আমায় আবার কেউ বেঁধে রাখবে না তো?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল বাজনা।

"তুমি দুষ্টুমি না করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"না, না, সত্যি বলছি আমি লক্ষ্মী হব।"

"বেশ, কাল আমি আবার আসব। রাত হয়েছে, এখন আমি ফিরব।"

"কাল তো শেষ দিন!"

"কিসের শেষ?"

"কাল তিন দিন না! কাল যদি ঘণ্টা না থামে, তা হলে তো তোমাদের রাজা আমাকে মেরে ফেলবে!"

"আজকের দিনটি লক্ষ্মী হয়ে থাক, কাল এসে সব বলে দেব।"

"সত্যি!" আনন্দে নেচে উঠল বাজনা। লাফ দিল, তিড়িং! আরি ব্যস! কোথায় উঠে গেল! হুই-ই-ই ওপরে। আবার ধুপ করে মাটিতে পড়ল। একটুও লাগল না। বাঁদর যে! বাঁদর লাফালে লাগে কী!

অবাক লাগল বাজনার নিজেরই। এতখানি লাফাতে পারে সে! বাজনা নিজের মনেই খিলখিল করে হেসে উঠল। মেয়েটিকে বললে, "আমি বাঁদর, ভুলেই গেছলুম।"

মেয়েটি বললে, "আমি তা হলে যাই।"

বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "কাল ঠিক আসবে তো?"

"আসব।"

"আমি এখানে ঘোরাঘুরি করলে, কেউ বকাঝকা করবে না তো?"

"না, না। এখানে এখন আর কেউ আসবে না।" বলে মেয়েটি

হাঁটা দিল। নূপুর বাজল, ঝুন-ঝুন। ফিকে নীল আলোর মধ্যে হারিয়ে গেল মেয়েটি।

রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

অন্ধকারেই ছোটাছুটি লাগিয়ে দিল বাজনা। খুশিতে চেঁচিয়ে মাতিয়ে তুললে সেই নিঃঝুম জায়গাটা। সে খাঁচার থেকে ছাড়া পেয়েছে। এখন যা খুশি করতে পারবে। কেউ কিচ্ছু বলার নেই। তাই হাত-পা ছুড়ে নাচতে লাগল বাজনা। তিড়িং বিড়িং লাফাতে লাফাতে ওদিকে চলে গেল। আবার ফিরে এল। সমস্ত খুশি যেন একসঙ্গে বাজনার বুকে নেচে উঠেছে।

বাজনা এখন নাচছে, লাফাচ্ছে, ছুটছে।

নাচতে নাচতে হঠাৎ "বাঁদর-পাড়া"র পাঁচিলের ওপর লাফ দিল বাজনা। পাঁচিলের ওপর দিয়ে ছুটল। একটুও ভয় লাগছে না, মজা লাগছে। ছুটতে ছুটতে তোলপাড় সুরু করে দিলে, এ-পাঁচিল থেকে ও-পাঁচিল, ও-পাঁচিল থেকে সামনের ফটক। বাবা! সারা জায়গাটাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কোথাও একটু ফুটোফাটা নেই!

তারপর?

যাঃ! পাঁচিলের ওপর ছুটতে ছুটতে দিক হারিয়ে ফেললে বাজনা!

এ কোনদিকে এসে পড়েছে বাজনা! এদিকটা তো "বাঁদর-পাড়া" নয়! সব্বনাশ! কী হবে?

আর ছুটল না বাজনা। পাঁচিলের ওপরই বসে রইল। এদিক ওদিক জুলুক-জুলুক তাকিয়ে তাকিয়ে ঠাওর করতে লাগল। কিন্তু কিছুই তো দেখতে পাচ্ছে না স্পষ্ট করে। কোথায় চলে এসেছে, তা-ও বুঝতে পারছে না! কেমন করে বুঝবে? এখন বেশ রাত্তির। নিঃঝুম। লোকও নেই, জনও নেই। সবাই এখন ঘরে। ঘুমুচ্ছে। চারিদিকে শুধু অন্ধকার।

তা হলেও বসে থাকলে তো চলবে না। একটা কিছু করতেই হয়। "বাঁদর-পাড়া" তাকে খুঁজে বার করতেই হবে! কাল তার শেষ-দিন। মালতিদিদি এসে বলে দেবে, কেমন করে সে ঘণ্টা থামাবে। কেমন করে আবার সে মানুষ হবে। ভাবতে ভারি ভাল লাগছিল বাজনার।

তাই পাঁচিলের ওপর দিয়েই আবার হাঁটা দিলে। হাঁটতে হাঁটতে দূরে আলো দেখতে পেল বাজনা! আরও দূরে খুব উঁচু উঁচু বাড়ি। চওড়া চওড়া রাস্তা। আবছা-আবছা আলোয় এবার একটু একটু দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ বাজনার সারা শরীর শিউরে ওঠে! ঐ রাস্তাটা দিয়েই সকালে হাতির পিঠে চেপে বাজনা সহর ঘুরেছে না? হ্যাঁ, ঠিক বলেছে। আর ঐদিকটা? যেন আরও চেনা-চেনা! ঐটা তো রাজবাড়ি! ঐ তো পল্টনরা দাঁড়িয়ে আছে, পাহারা দিচ্ছে। পাহারা না আর কিছু! দিব্যি ঢুলছে।

বাজনা খুব চুপিচুপি এগিয়ে গেল। ঐ তো রাজবাড়ির সিংদরজা। পাঁচিলের ওপর হাঁটতে হাঁটতে সিংদরজা পেরিয়ে গেল বাজনা। একেবারে রাজ-দরবারের মুখোমুখি এসে পড়েছে। উঃ বাবা! চারি-দিক কী চুপচাপ! একটি পাতারও শব্দ নেই। হয়তো রাজা ঘুমুচ্ছে এখন! কী চেহারা রাজার। মরে যাই মুখখানা দেখে! রাজা, না ভেঁকাকি! কিন্তু রাজার চেহারার বিচার করেই বা কী করবে? বাজনার নিজের চেহারাটা কী হয়েছে? কী ছিরি!

ঐ তো রাজ-দরবার! ঐখানেই তো পল্টনরা বাজনাকে নিয়ে গেছল। ঐখানেই তো রাজা ওর কাছ থেকে টাট্টুকে কেড়ে নিয়েছে। কী যেন নামটা রাজার! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, চক্কুর চ্যাং-চ্যাং। হেসেই ফেলে বাজনা। যেমন রাজা, তেমনি নাম!

"টাট্টু!" খুব আস্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল বাজনার। মনে পড়ে যায় টাট্টুর কথা! বুকটা চমকে ওঠে। টাট্টু হয়তো এখনও

রাজার ঘরে বন্দী হয়ে আছে! হঠাৎ বাজনার মনে হল টাট্টুকে খুঁজে বার করলে তো হয়। যখন রাজার ঘরের সামনেই এসে পড়েছে বাজনা, তখন চেষ্টা করতে দোষ কী! না, টাট্টুকে খুঁজে পেতেই হবে।

টুপ করে লাফিয়ে পড়ল বাজনা রাজ-দরবারের সামনে। সুট করে ভেতরে ঢুকে গেল। আবছা-আবছা আলো জ্বলছে। একটা আড়াল দেখে লুকিয়ে পড়লে ভাল হয়। কিন্তু লুকাবে কোথায়? সব ফাঁকা! ঐ তো সিংহাসনটা দেখতে পাচ্ছে বাজনা। সিংহাসনের অনেকখানি পেছনে, পাশের দিকে আর একটা দরজা। গুটিগুটি এগিয়ে গেল সেদিকে। দরজার পর্দা সরিয়ে উঁকি মারলে বাজনা। চট করে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

আঃ! কী সুন্দর এদিকের এই ঘরটা! ফুর ফুর করে হাওয়া বইছে। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়। আরে! আরে! ঐ তো রাজা! পালংকে শুয়ে আছে। সত্যি! যাচ্ছেতাই দেখতে। রাজা বলে মানে কী করে এখানকার মানুষগুলো। দেখো, অমন বিচ্ছিরি চেহারা, কিন্তু সেই ঝকমকে টিপটি এখনও ঠিক কপালে রয়েছে। টিপের আলো কড়িকাঠে ছড়িয়ে পড়েছে।

বাজনা পর্দার আড়াল সরিয়ে যেই এক পা ভেতরে গেছে, অমনি যেন কে খুব নরম গলায় ডাকল, "বাজনা!"

বুকটা ধক করে উঠল বাজনার। আগু-পিছু কিচ্ছু না দেখে, কিচ্ছু না ভেবে ছুটে পালংকের নিচে লুকিয়ে পড়ল।

"বাজনা, লুকাচ্ছ কেন? আমি।"

বাজনা তবুও বেরুল না।

"বাজনা বেরিয়ে এস, আমি টাট্টু।"

বুকটা থমকে গেল বাজনার। "টাট্টু!" উঁকি মারল পালংকের নিচ থেকে।

"ওখান থেকে দেখতে পাবে না আমায়। আমি সিন্দুকের মাথার

ওপর বসে আছি। বাঁদিকে দেখো!"

বাঁদিকে চোখ ফেরাল বাজনা। একটা সিন্দুক দেখা যাচ্ছে বটে! সিন্দুকের মাথার দিকে চাইল বাজনা। হ্যাঁ, সত্যিই তো টাট্টু বসে আছে!

বেরিয়ে পড়ল বাজনা পালংকের নিচ থেকে। ছুটে চলে গেল সিন্দুকটার সামনে। মারল লাফ, একেবারে সিন্দুকের মাথায়। জড়িয়ে ধরল টাট্টুকে দু'হাত দিয়ে।

"টাট্টু!" আনন্দে লাফিয়ে আর একটু হলেই বাজনা চেঁচিয়ে ফেলেছিল!

টাট্টু তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিল বাজনাকে। চাপা গলায় বললে, "এখানে কোন কথা নয়, বাইরে চল।"

বাজনাও চটপট টাট্টুকে নিয়ে বাইরে ছুট দিতে গেল।

টাট্টু বললে, "দাঁড়াও, দাঁড়াও।"

"কেন?"

"একটা কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ?"

"চক্কুর চ্যাং-চ্যাং-এর কপালে যে-টিপটা দেখতে পাচ্ছ, ওটা নিতে হবে।"

বাজনা ভয় পেয়ে গেল। বললে, "বাবা! কেমন করে নেব? ঘুম ভেঙে গেলে!"

"নিতেই হবে। তোমার এখন খুব অসুবিধা নেই। লাফ দিয়ে ঐ জানলা গলে পালাবে।" বলে টাট্টু চক্কুর চ্যাং-চ্যাং-এর বিছানার ঠিক ওপরে, মাথার দিকে জানলাটা দেখালে।

বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "টিপটা বুঝি খুব দামী?"

টাট্টু বললে, "খুব কাজের।"

"তা হলে তো নিতেই হবে।"

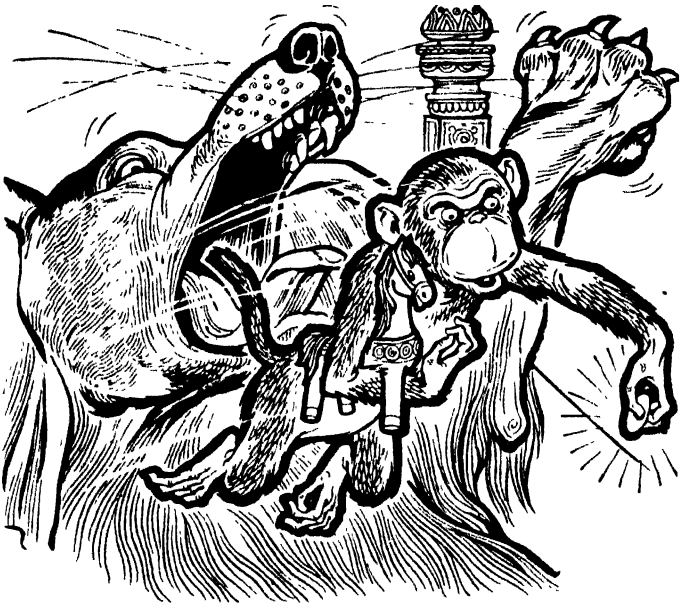

"তাড়াতাড়ি কর। নইলে রাজার ঘুম ভেঙে যেতে পারে।"

বাজনা এক হাতে টাট্টুকে বাগিয়ে ধরলে। নিঃসাড়ে রাজার পালংকে উঠে পড়ল। ঝট করে চ্যাং-চ্যাং রাজার কপাল থেকে টিপটা ছিনিয়ে নিয়ে মারলে লাফ। একেবারে জানলা দিয়ে বাইরে। চক্কুর চ্যাং-চ্যাং থতমত খেয়ে লাফিয়ে উঠল। আঁকপাঁকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ধর, ধর, পালাল, পালাল।"

রাজার চেঁচামেচি, হাঁকাহাঁকি শুনে হৈ হৈ, রৈ রৈ করে সকলে ছুটে এল। কী হলো? কী হলো?

চক্কুর চ্যাং-চ্যাং চোখ দুটো কপালে তুলে বললে, "টিপ চুরি গেল।"

অমনি শিঙা বেজে উঠল, প্যাঁ-প্যাঁ-প্যাঁ। সমস্ত রাজবাড়িটা তটস্থ হয়ে জেগে উঠল। চেঁচামেচি সুরু হয়ে গেল, "রাজার টিপ চুরি গেছে।"

কে চুরি করল?

কে চুরি করল?

চক্কুর চ্যাং-চ্যাং বললে, "বাঁদর।" বলে হাত-পা ছোড়াছুড়ি লাগিয়ে দিলে।

বাজনা ততক্ষণে জানলা গলে মস্ত উঁচু পাঁচিলটায় লাফিয়ে উঠে বসেছে। রাত্তির বলে কারো নজরই যাচ্ছে না সেদিকে।

শিঙা বাজছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ঢাম-কুড়-কুড় করে হুঁসিয়ারির ঢ্যাঁড়া পড়ে গেল। পল্টনরা রাজবাড়িটা ঘিরে ঘিরে ছুটতে লাগল। যেন বাঁদর পালাতে পারে না। খুঁজতে লাগল বাঁদরটাকে।

খুঁজতে খুঁজতে একজন পল্টন বাজনাকে পাঁচিলের ওপর দেখতে পেয়ে গেছে! এই রে! পল্টন চেঁচিয়ে উঠল, "ঐ বাঁদর।"

অমনি "ঐ বাঁদর, ঐ বাঁদর" বলতে বলতে হাজার হাজার পল্টন ছুটে এল।

বাজনা ভাবলে, এবার গেছি! বললে, "টাট্টু, টাট্টু, এবার কী করি?"

টাট্টু বললে, "তাড়াতাড়ি রাজবাড়ির বাইরে লাফিয়ে পড়।"

"বাইরের রাস্তায় পল্টন যে!"

"থাক পল্টন। লাফ দিয়েই রাজার টিপ আমার কপালে ঠেকিয়ে দিও।"

"তারপর?"

"তারপর যা করার আমি করব।"

ঠিক তাই। পল্টনরা বাইরে নিচে হৈ হৈ করছে, আর বাজনা মারল লাফ। লাফ মেরেই টাট্টুর কপালে ছুঁইয়ে দিল টিপটা।

ওমা, দেখো! দেখো! টিপটা টাট্টুর কপালে আটকে গেল, আর কাঠের ঘোড়া টাট্টু একটা মস্ত জ্যান্ত ঘোড়া হয়ে "চিঁহিঁহিঁ" করে চেঁচিয়ে উঠল! চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে, "বাজনা, আমার পিঠে লাফিয়ে ওঠ।"

বাজনা তো ভ্যাবাচাকা! লাফিয়ে উঠল টাট্টুর পিঠে। টাট্টু বাজনাকে পিঠে নিয়ে ছুট দিল। টগ-বগ, টগ-বগ!

পল্টনরা তাই না দেখে একেবারে থ। কী করব, কী করব ভাবতে-ভাবতেই টাট্টু চোখের বাইরে চলে গেল! অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

বাজনাকে পিঠে নিয়ে অনেকক্ষণ ছুটল টাট্টু। ছুটতে ছুটতে একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বাজনা অবাক হয়ে টাট্টুর গলা জড়িয়ে ছুটছে আর ভাবছে, বাবা! এ আবার কী কাণ্ড!

জঙ্গলের বেশ খানিকটা ভেতরে এসে টাট্টু হাঁপ ছাড়ল।

বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "এখানে কেন?"

টাট্টু বললে, "লুকিয়ে থাকতে হবে। তা না হলে ধরা পড়বে। পল্টনরা সহজে ছাড়বে না!"

আরও খানিকটা এসে টাট্টু একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে, "বাজনা, এক কাজ কর, টিপটা আমার কপাল থেকে তুলে তোমার কপালে ছুঁইয়ে দাও।"

বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "কেন?"

"দেখো না কী হয়!"

যা বলা সেই কাজ। বাজনা সঙ্গে সঙ্গে টাট্টুর ঘাড়ে হামাগুড়ি দিয়ে, গলা জড়িয়ে, কপাল থেকে টিপটা তুলে নিল। যেই তুলেছে ব্যস! অত বড় একটা জ্যান্ত টাট্টু হুস করে আবার আগের মতন

কাঠের খেলনা হয়ে গেল। অমনি বাজনা টাট্টুর পিঠ থেকে ধপাস করে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে! কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে পড়ল বাজনা। যাক! রক্ষে! লাগে নি তেমন। উঠেই টাট্টুকে হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "এ কী হল?"

টাট্টু বললে, "এর নাম যাদু। এবার টিপটা তোমার কপালে ছোঁয়াও!"

টাট্টুর কথা শুনে টিপটা এবার নিজের কপালে ছোঁয়ালে বাজনা। আর দেখতে হয়! বাজনার বাঁদর-মার্কা ল্যাজটা পুট করে মাটিতে খসে পড়ল। গায়ের লোমগুলো হাওয়ায় উড়ে উড়ে ঝরঝরে হয়ে গেল। বাজনা আর বাঁদর রইল না। এখন আবার সেই নাক চ্যাপ্টা, গাল ফোলা, দাঁত ফোকলা ছোট্ট ছেলেটি!

নিজের দিকে তাকিয়ে খুশিতে নেচে উঠল বাজনা। জঙ্গলের মধ্যেই হাঁকাহাঁকি সুরু করে বললে, "টাট্টু, টাট্টু, আমি আবার মানুষ হয়ে গেছি। আমার বড় গান গাইতে ইচ্ছে করছে!"

টাট্টু বললে, "বাজনা, গান গাইবার এখনও অনেক সময় আছে। এখনও আসল কাজ হয় নি। নামটা তোমার বাজনাই আছে। নামের রোগ তোমার এখনও সারে নি। বেশি নাচানাচি, চেঁচামেচি না করাই ভাল। দেখছ তো, বিপদ সামনে, পেছনে, সবদিকে। খুব সাবধানে চলতে হবে। টিপটা কাপড়ের খুঁটে বেঁধে রাখ। আবার কাজে লাগতে পারে!"

"ঠিক বলেছ টাট্টু।" বলে বাজনা কাপড়ের খুঁটে টিপটা বেঁধে সামলে রাখলে। তারপর জিজ্ঞেস করলে, "এবার কী করব? এ যে দেখছি গভীর জঙ্গল!"

টাট্টু বললে, "চক্কুর চ্যাং-চ্যাং-এর পল্টনরা সহজে ছাড়বে না। লুকিয়ে-ছাপিয়ে জঙ্গলের আরও ভেতরে হাঁটা দাও। আজকের রাতটা জঙ্গলেই গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। তারপর কাল যা

হবার হবে।"

বাজনা বললে, "টাট্টু, এ যে ভীষণ অন্ধকার! হাঁটি কেমন করে?"

টাট্টু বললে, "অন্ধকার দেখে পিছিয়ে গেলে চলে! অন্ধকারে যারা ঠিক-ঠিক পা ফেলে চলতে পারে আলো তারা দেখতে পাবেই।"

টাট্টুর কথা শুনে বাজনা সাবধানে পা ফেলে হাঁটা দিলে। দুজনেই চুপচাপ। জঙ্গলও নিশ্চুপ! চক্কুর চ্যাং-চ্যাং-এর টিপের উদ্ভুট্টি ব্যাপারটা যে বাজনা টাট্টুকে ভাল করে জিজ্ঞেস করবে, তাও সাহস হল না। আশ্চর্য! একটা সামান্য টিপ কপালে ঠেকাতেই কাঠের ঘোড়া একটা মস্ত জ্যান্ত ঘোড়া হয়ে গেল! ভাবতেই গাটা শিউরে উঠছে বাজনার!

অনেকটা হাঁটার পর বাজনা হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। চোখ দুটো বড় বড় করে, কান খাড়া করে এদিক ওদিক তাকায় বাজনা।

টাট্টু খুব চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে, "কী হল? থামলে?"

বাজনা টাট্টুর কানের কাছে মুখ এনে বললে, "শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ! তুমি শুনতে পাচ্ছ না? কে যেন হাঁটছে! খসখসিয়ে বাজছে!"

টাট্টু গলার স্বর আরও চেপে বললে, "সাবধান, দেখতে না পায়! লুকিয়ে পড়!"

বাজনা আলতো আলতো পা ফেলে চটপট সামনের মস্ত গাছটার আড়ালে চলে গেল। গুঁড়ির নিচে হামাগুড়ি দিয়ে থমকে বসে পড়ল।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ পেছন ফিরে চমকে উঠল বাজনা। একটা বেড়াল! দেখতে পেয়েছে বাজনাকে। একেবারে তার পেছনে দাঁড়িয়ে! বেড়ালটা বাজনাকে দেখে গোঁফ ফোলালে, চোখ পাকাল।

বাজনাকে চোখ টেরিয়ে দেখল। বাজনা ধড়ফড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বেড়াল ডাকল, "ম্যাও।" যেন রাগে গলা গরগর করছে।

বাজনা দেখলে ধরা তো পড়েইছি। বেড়ালটার সঙ্গে মিষ্টি কথা বলে ভাব করে ফেলাই ভাল। তাই বাজনা আদর করে ডাকলে, "বেড়াল, বেড়াল, বেড়ালটা।"

বেড়াল উত্তর দিলে, "কীরে, কীরে, ছেলেটা? রাতদুপুরে লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে কী করছিস, ম্যাও?"

বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "তোমার ঘর কোথা গো?"

"আমার ঘর নেই, দোর নেই।"

"তোমার ঘর নেই, দোর নেই তো মা কোথা?"

"আমার মা নেই, বাবা নেই।"

"তবে তোমার কে আছে?"

"তোর এত জমা-খরচের দরকার কী, ম্যাও?" বেড়ালটা ধমক দিল। ধমক দিয়ে হাঁটা দিল।

বাজনাও পিছু পিছু পা বাড়াল। হাঁটতে হাঁটতে বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "ও বেড়াল, কোথা যাও?"

বেড়াল বললে, "যেথা যাই, সেথা যাই, তোর তাতে কীরে! তুই কে রে ছেলেটা আমার পিছু ডাকছিস? আমার পিছু হাঁটছিস? নাম কীরে তোর?"

বাজনা বললে, "আমার নাম নেই।"

বেড়ালটা বাজনার কথা শুনে "ম্যাও-হো-হা-হো" করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে, "সেটা কেমন ব্যাপার?"

বাজনা হাসি শুনে থতমত খেয়ে গেল। বললে, "না, নাম আমার একটা আছে, কিন্তু বিচ্ছিরি। তাই কাউকে বলি না!"

"তাই বল। তা এখানে ঘুরঘুর করছিস কেন?"

"হুমচক্কার দেশ খুঁজছি।"

বেড়ালটা চমকে থামল।

বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "তুমি চমকাও কেন?"

"বেশ করেছি।"

"তুমি বুঝি জান?"

"জানি তো জানি, বলব কেন?" বলে বেড়ালটা আবার হাঁটতে সুরু করে দিলে।

বাজনা আবার ডাকলে, "ও বেড়াল, ও বেড়াল, শোন, শোন।"

বেড়াল বললে, "যাই বল আর তাই বল, হুমচক্কার দেশ কোথায় জানলেও বলব না।"

টাট্টু বললে, "বাজনা ছেড় না, ছেড় না। ওর পিছু নাও। ও নিশ্চয়ই জানে।"

বাজনা বললে, "তাই নাকি!" বলে বেড়ালের পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে আবার বললে, "ও বেড়াল, বল না!"

"আঃ গেল্ল যাঃ! মাথা খারাপ করে দিলে। জ্বালাতন!" খেঁকিয়ে উঠল বেড়ালটা।

বাজনা বললে, "আচ্ছা বেশ! হুমচক্কার দেশ কোথা, নাই বললে। জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছি, বাইরে যাবার পথটা বলে দাও?"

"যে-পথ দিয়ে ঢুকেছিস, সে পথ দিয়ে বেরিয়ে যা।" বলে এবার বেড়ালটা ছুটতে আরম্ভ করে দিলে।

বাজনা টাট্টুকে জিজ্ঞেস করলে, "টাট্টু, টাট্টু, কী করি?"

টাট্টু বললে, "লুকিয়ে লুকিয়ে ওর পিছু ছোট।"

বাজনাও লুকিয়ে-ছাপিয়ে বেড়ালের পিছু নিলে।

অনেকক্ষণ ছুটলে। জঙ্গলের আর শেষ নেই। জঙ্গল যেন বেড়েই চলেছে। বাজনা জিজ্ঞেস করলে, "টাট্টু, বেড়াল যে থামে না আমি থামব?"

টাট্টু বললে, "না, ঐ সামনে দেখো!"

বাজনা বললে, "সামনেই তো দেখছি!"

"ভাল করে চেয়ে দেখো।"

বাজনা চোখ বড়-বড় করে চেয়ে দেখল।

কী দেখল?

দেখল একটু দূরে একটা ছোট্ট ঘর। চারিদিকে গাছ-গাছ, ঝোপ-ঝোপ, তার আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ঘরটা। অন্ধকারে মিটমিট করে আলো জ্বলছে ঘরের মধ্যে। একটু একটু আলো দেখা যাচ্ছে।

অন্ধকার রাতটা,
ঘুপ-চুপ-চুপ বনটা,
ঘুর-ঘুপটি ঝোপটা,
তার মধ্যে ছোট্ট মত ঘরটা।

বেড়ালটা ছুটতে ছুটতে ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। দেখতেও পেল না বাজনা নামে ছেলেটা, কাঠের টাট্টু খেলনাটাও তার পেছনে ধাওয়া করেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে তার সঙ্গে ঘরের সামনে চলে এসেছে!

বেড়ালটা ঘরে ঢুকেই দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বাজনা দরজার গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়াল। যেখান দিয়ে একটু একটু আলো আসছিল সেইদিকে উঁকি মারলে।

"কে এলি রে, কে এলি?" কে যেন ডাকল। কার যেন কাঁপা-কাঁপা গলার স্বর!

বাজনা উঁকি মারতেই নজরে পড়ল, একটা বুড়ি। অন্ধকার ঘরে পিদিম জেবলে বসে আছে। বুড়ির একটা চোখ কানা-কানা। এত-খানি নাকখানা। খোঁচা-খোঁচা নোখগুলো। সাদা-সাদা চুলগুলো। রোগা-রোগা শুঁটকী। কত বয়স বুড়ির কে জানে! একশো কি দুশো, বাজনা বুঝতেই পারে না।

বেড়ালটা ঢুকেই হাঁপাতে হাঁপাতে বুড়ির কোলে বসে পড়ল।

বুড়ি বললে, "মেনি এলি?"

বেড়ালটা তবু হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "হ্যাঁগো ঠাকমা, আমি।"

"কী হয়েছে বাছা, হাঁপাচ্ছিস কেন?"

বেড়াল ভয়ে ঠাকমাকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, "ঠাকমা, ঠাকমা, একটা ছেলে। আমায় দেখতে পেলে। দেখতে পেয়ে আমার পিছু নিলে।

"কে ছেলেটা?"

"কী জানি। হুমচক্কার দেশ কোনদিকে আমার কাছে জানতে চাইলে।"

বুড়ির কানা চোখটা বুজে গেল। ভাল চোখটা ড্যাবড্যাব করে জ্বলে উঠল। বুড়ির এত্তো উঁচু নাকটা ফুলে উঠল। খোঁচা-খোঁচা নোখগুলো খটখট করে বেজে উঠল। বাজনা ভয় পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

বুড়ি ছটফটিয়ে খ্যান-খ্যান করে চেঁচিয়ে উঠল, "এলেটা, বেলেটা কোথাকার ছেলেটা?"

মেনি বললে, "ঠাকমা, ঠাকমা, ছেলেটার নাম নেই।"

"নাম নেই তো কাম কী তার?"

"তার নাম জানি না, কাম জানি না। শুধু দেখলুম তার হাতে একটা কাঠের ঘোড়া, খেলনা।"

বুড়ি ঘোড়ার নাম শুনে চমকে উঠল।

বেড়াল জিজ্ঞেস করলে, "চমকাও কেন গো ঠাকমা?"

"মেনি, মেনি, মেনি," বুড়ি ধড়ফড়িয়ে উঠেছে।

বেড়াল ছটফটিয়ে বললে, "কেন? কেন? কেন?"

"ছুট্টে যা!"

"কোথা যাব?"

"দেখগে যা, ছেলেটা ঘরের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে আছে কিনা!" বলেই বুড়ি বেড়ালটাকে কোল থেকে ঠেলে দিলে। বেড়ালটা উঠে পড়ল।

বেড়ালটা উঠল যেই, বুড়িটা দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠকঠকিয়ে কাঁপছে! যেন বাঁশ-পাতা!

বেড়ালটা দরজা ঠেললে।

বুড়িটা পিদিম নিয়ে পথ দেখালে।

বাজনার বুক শুকিয়ে আমচুর!

বাজনা টাটুর কানে কানে জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় লুকাই?"

টাটু বললে, "ঝটপট দরজার আড়ালে চলে যাও।"

"দেখতে পাবে যে!"

"না, পাবে না। বুড়ির চোখ কানা, বেড়ালটাও তালকানা!"

বাজনা চটপট দরজার আড়ালে ঘাপটি মেরে সিঁটিয়ে রইল।

বেড়ালটা দরজা ঠেলে বাইরে এল। বাজনা দরজায় আড়াল পড়ে গেল।

বেড়ালটা আলতো-পায়ের ডিঙি মেরে হাঁটছে আর খুঁজছে।

বুড়িটাও পিদিম নিয়ে দেখছে আর ঘুরছে।

টাটু ফিসফিস করে বললে, "বাজনা, ঘরে ঢুকে পড়।"

বাজনা দরজার আড়াল থেকে চট করে ঘরে ঢুকে পড়ল।

"বাজনা, বাজনা, ঐ কাঠের সিন্দুকের আড়ালে লুকিয়ে পড়।"

বাজনা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে একটা সিন্দুক খুঁজে পেলে। চটপট তার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে চুপটি করে বসে রইল।

বুড়ি ঘরের বাইরে এ-ঝোপ দেখল।

বেড়াল ওদিক দেখল।

এ-গাছ দেখল। ও-ঝাড় দেখল। কিন্তু কই? কেউ নেই তো!

বেড়াল বললে, "ও ঠাকমা, ও ঠাকমা, কেউ নেই।"

বুড়ি জিজ্ঞেস করলে, "ভাল করে দেখেছিস তো?"

বেড়াল বললে, "দেখলুম তো!"

"উঃ! খুব রক্ষে!" হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন! বললে, "চ, ঘরে চ।" ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

ঘরে ঢুকে মেনি বললে, "ঠাকমা, ঠাকমা, আমার হাসি পাচ্ছে।"

ঠাকমা বললে, "আমারও।"

"তোমারও?" বলেই বেড়ালটা "ম্যাঁ-ও-ও-ও" করে হেসে উঠেছে।

বুড়িটাও "হিঁ-হিঁ-হিঁ" করে হেসে ফেলেছে।

হাসতে হাসতে বুড়ি মাটির ওপর ধপাস করে বসে পড়ল। বেড়ালটাও বুড়ির কোলের ওপর উঠে পড়ল। বেড়াল হাসতে হাসতে বুড়ির গলা জড়িয়ে ধরলে। বুড়িও বেড়ালের গলা জড়ালে। তারপর দুজনে গলা জড়াজড়ি করে বেদম হাসতে সুরু করে দিলে। হেসে কুটোকুটি।

হাসি থামলে বুড়ি বললে, "মেনি, মেনি, মেনি।"

মেনি বললে, "কেন গো?"

"ভাগ্যিস ছেলেটাকে তুই আমার বাক্সের কথাটা ফস করে বলে ফেলিস নি!"

বেড়াল বললে, "পাগল! তাই আবার বলে!"

"তাই রক্ষে! তা না হলে ছেলেটা ঠিক আসত।"

বেড়াল বললে, "ঠাকমা, তুমি আমাকেও তো কোনদিন বাক্সটা দেখালে না!"

"ভয় করে!"

"কেন গো ঠাকমা?"

"কেউ যদি জেনে ফেলে!"

"তোমারও মাথা খারাপ! এই ঘুপ-চুপটি বনে আছেই বা কে, জানছেই বা কে!"

"দেওয়ালেরও কান আছে।"

"কান আছে, চোখ তো নেই। একবার দেখাও না বাক্সটা!"

"দেখবি? দেখাতে পারি। কাউকে বলবি না তো?"

বেড়াল বললে, "ঠাকমা, ঠাকমা, আমায় তুমি বিশ্বাস কর না?"

বুড়ি বললে, "মেনি, মেনি, মেনি, আমার তো ছেলে নেই, তুই আমার ব্যাটা হবি?"

"হ্যাঁ গো ঠাকমা!"

"মেনি, মেনি, মেনি, আমার তো নাতি নেই, তুই আমার নাতি হবি?"

"হ্যাঁ গো ঠাকমা!"

"তবে আয় দেখবি আয়।" বলে বুড়ি সেই মস্ত কাঠের সিন্দুকটার কাছে এল। বাজনার বুক ধড়ফড়িয়ে উঠল। এই বুঝি বুড়ি দেখে ফেলে! বাজনা তো পেছনে লুকিয়ে, বুড়ি দেখবে কেমন করে!

বুড়ি সিন্দুকের ডালাটা খুলে ফেললে। "ক্যাঁচ" করে আওয়াজ হল। বাজনা নড়েচড়ে বসল। খুব গুটিসুটি মেরে টুক করে একবার উঁকি মারল। বাবা! গোটা সিন্দুকটাই তো মোটা মোটা লোহার শেকল দিয়ে বাঁধা! সিন্দুকটা খুলতেই বুড়ির যে চোখটা কানা নয়, সেটা যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল। উঃ! দেখলেই ভয় করে! বাজনা ঝাঁ করে আবার সিন্দুকের আড়ালে মুখটা সরিয়ে নিলে।

সঙ্গে সঙ্গে ঝন-ঝন-ঝন করে কিসের যেন আওয়াজ হল! আবার চমকে চাইল বাজনা। আরি বাবা! ঘরটা যে আলোয়-আলো হয়ে গেছে! ফোঁটা ফোঁটা আলো আর আলোর রঙ দেওয়ালে-

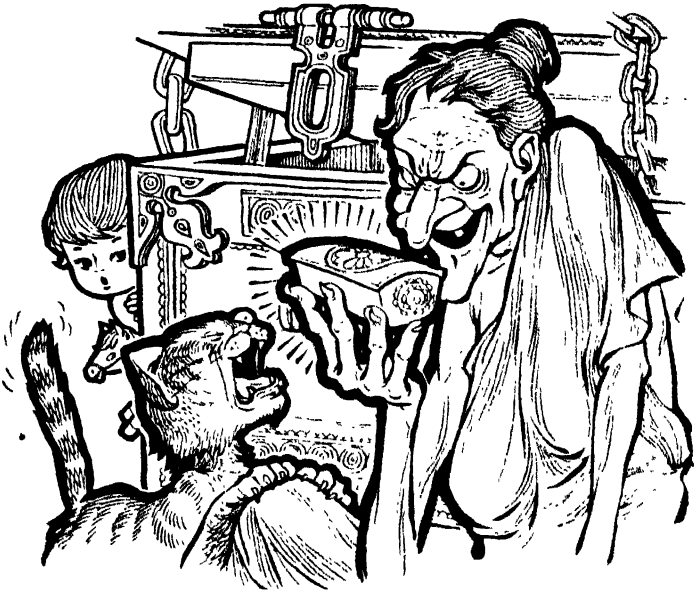

দেওয়ালে নেচে উঠেছে। বুড়ির হাতের দিকে বাজনার চোখ দুটো ঝট করে ঘুরে গেল। আহা! বুড়ির হাতে একটা কী সুন্দর ঝকমকে বাক্স, ছোট্ট মত! প্রদীপের আলো পড়েছে বাক্সটার ওপর। আর বাক্সের ঝকমকি ঠিকরে ঠিকরে পড়েছে ঘরের চারিদিকে, দেওয়ালে দেওয়ালে!

অবাক হয়ে দেখতে লাগল বাজনা।

বেবাক হয়ে চেয়ে রইল বেড়ালটা।

পিটির পিটির দেখতে লাগল টাট্টু।

বুড়ি বেড়ালকে জিজ্ঞেস করলে, "দেখলি তো?"

বেড়াল উত্তর দিলে, "কই গো ঠাকমা? দেখলুম কই?"

"কেন? এই তো!"

"বাক্সে তোমার চাবি আঁটা। খোল, ভেতরটা দেখি!"

"হায় বাছা, সেই তো মুশকিল!"

"কেন? মুশকিল কেন?"

"চাবি কি আর আছে! চাবি যে হারিয়ে গেছে!"

"হারিয়ে গেছে! কেমন করে?"

"আর বলিস কেন? চাবি কী আর আজ হারিয়েছে! দুশো বছর হয়ে গেল।"

"তোমার বয়স কত হবে গো ঠাকমা?"

"আমার বয়সের হিসেব আছে কি!"

"চাবি হারাল কেমন করে?"

"ও বাবা, সে এক মস্ত কাণ্ড! বলতে গেলে রাত পোয়াবে।"

বেড়াল বললে, "বল না, জেগে থাকব।"

"আমার যে ঘুম পাচ্ছে।" বলে বুড়ি হাই তুললে, "হাউ-উ-উ।"

"একদিন না ঘুমুলে কী হয়েছে?"

"না, কিচ্ছু নয়। তবে শোন।" বলে বুড়ি সেই ঝকমকে বাক্সটা আবার সিন্দুকে পুরে রাখলে। সিন্দুকের ডালাটা ঘট করে বন্ধ করে দিল। দিয়ে সিন্দুকের পিঠে ঠেস দিয়ে বেড়ালকে কোলে নিলে। গল্প বলতে সুরু করলে। বললে :

একবার জানিস এক রাজার এক মেয়ে হল। মেয়ের হাত আছে পা আছে, চোখ আছে, কান আছে। নাক নেই। নাক একেবারে মুখের সঙ্গে চ্যাপ্টা! মেয়ের জন্যে রাজার ভাবনা যেমন, লজ্জারও তেমনি একশেষ। মেয়েকে কারো সামনে বারও করতে পারে না। নাক চ্যাপ্টা মেয়ের বিয়েই বা দেবে কেমন করে? রাজা বললে, যে তার মেয়ের নাক গজিয়ে দেবে সে যা চাইবে, রাজা তাকে তাই দেবে।

তা চেষ্টার কী শেষ আছে? কত মানুষ কত চেষ্টা করলে। কিন্তু বাপরে বাপ! নাক গজানো কী চারটিখানি ব্যাপার! শেষে আমার কানে যখন কথাটা পেঁছুল আমি ভাবলুম, দিই না মেয়ের নাক গজিয়ে। আমার বাক্সে তো সব আছে!

বেড়াল জিজ্ঞেস করলে, "ঠাকমা, তোমার বাক্সে নাক আছে?"

"হ্যাঁরে বাবা! যার যা নেই, চাইলেই পাবি।"

"আচ্ছা, ঠাকমা, আমার তো একটা ল্যাজ। আমি যদি দুটো চাই?"

বুড়ি বললে, "পাবি।"

বেড়াল অবাক হয়ে বললে, "বাবা! তারপর কী হল ঠাকমা?"

তারপর কী হল জানিস? যেদিন যাব বলে সব ঠিকঠাক, বেঁধে-থুয়ে তৈরি, তখন খেয়াল হল, তাইতো! অতদূরে রাজবাড়ি, যাই কেমনে। হায় কপাল! আসল কথাটাই মনে আসে নি। চেয়ে দেখি, ঠিক তক্ষুনি আকাশে একটা শুকনি পাখি উড়ে যাচ্ছে। আমি ডাকলুম, "শুকনি, শুকনি, আয়, আয়।"

শুকনি বললে, "যাই, যাই।"

বলতে বলতে আকাশ থেকে শুকনিটা উড়ে এল মাটিতে। আমি সেজেগুজে, ঐ যে তরোয়ালটা দেখছিস দেওয়ালে ঝোলানো, ঐটা কোমরে বেঁধে, বাক্সটা হাতে নিয়ে তার পিঠে বসলুম। বললুম, "চ তো, যে-রাজার মেয়ের নাক চ্যাপ্টা, সেই রাজার কাছে নিয়ে চ তো আমায়।"

শুকনি আমায় পিঠে নিয়ে উড়তে আরম্ভ করলে। একটা উঁচু-উঁচু পাহাড়। পাহাড়ে বরফ-বরফ ঠান্ডা। ঠান্ডাতে গা শিরশির হাওয়া। উড়তে উড়তে শুকনিটা সেখানে এলে আমার তো শীতে ঠকঠকানি ধরে গেল। আমি বললুম, "ও শুকনি, গা শিরশির করে।"

শুকনি বললে, "চুপচাপ বসে থাক।"

আমি আবার বললুম, "ও শুকনি, দাঁত ঠকঠক করে!"

শুকনি বললে, "দাঁতে দাঁতে চেপে থাক।"

আমি আর একবার বললুম, "ও শুকনি, ও শুকনি, ঠাণ্ডাতে গা জ্বর-জ্বর করে।"

শুকনি মুখ-ঝামটা দিয়ে বললে, "কোথায় নামব, দেখছ না নিচে!"

শুকনির কথা যেন কেমন বেঁকা-বেঁকা। নিচে চেয়ে দেখি সত্যিই বরফ আর বরফ! সাদা সাদা ঝকমকে বরফের ওপর রোদ পড়ে ঝলসে যাচ্ছে! দেখতে ভালই লাগে! কিন্তু বরফ দেখব কী! ঠাণ্ডায় আমার প্রাণ যায়-যায়!

আর একটু যেতেই শুকনি বললে, "বুড়ি, বুড়ি, বুড়ি।"

আমি বললুম, "কী করি, কী করি, কী করি!"

শুকনি বললে, "তুমি মরবে, না বাঁচবে?"

"মানে!" শুকনির কথা শুনে আমার যেন ধাত ছেড়ে গেল!

"বাঁচতে যদি চাও, তো ঐ বাক্সটা আমায় দাও। বাক্স দিলে, আমি তোমায় পাহাড় ডিঙিয়ে রাজার দেশে নিয়ে যাব।"

আমার তো রাগে গা রি-রি করে উঠল। ভয়ও হল সাংঘাতিক। ভাবলুম, আগে তো বাঁচতে হবে, তারপর অন্য কথা। ভেবে শুকনিকে বললুম, "দেব, দেব, তোকে বাক্স দেব, আগে আমায় বাঁচা বাছা!"

শুকনি বললে, "ঠিক তো?"

আমি বললুম, "বেঠিক বলে বেঘোরে মরব নাকি!"

অমনি শুকনিটা হুস হুস করে উড়ে উড়ে পাহাড় ডিঙুলে। পাহাড় ডিঙিয়ে একটা গ্রামে পড়ল। আমি বললুম, "শুকনি, এবার একটু ডাঙায় নাম।"

শুকনি ডাঙায় নামল। যেই নেমেছে, আমি অমনি ঐ বাক্সটা দিয়ে মেরেছি শুকনির মাথায় এক বারি। ব্যস। মাথাটা ছেঁচে শুকনিটা মরে গেল! ওমা! মরলে কী হবে? মরা শুকনিটা একটা টাট্টু ঘোড়া হয়ে আমার সামনে চিঁহিঁ-হিঁ-হিঁ করে ডেকে উঠল। কী সব্বনাশ! আমিও তিড়িং করে ঘোড়ার পিঠে চেপে পড়েছি।

ঘোড়া ছুটতে ছুটতে চরকি খেতে সুরু করে দিলে। আমি ভাবলুম, কী ব্যাপার! ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে চরকি খায় কেন? জিজ্ঞেস করলুম, "কী রে ঘোড়া, একই পথে চরকি খাস কেন?"

ঘোড়া বললে, "না গো বুড়ি, তুমি কী চোখে দেখতে পাও না! এই তো যাচ্ছি!" বলে ঘোড়া যেমন ছুটে ছুটে চরকি খাচ্ছিল, তেমনিই চরকি খাচ্ছে!

ঘোড়ার পিঠে চরকি খেতে খেতে আমারও মাথায় চরকি লেগে গেল। বনবন করে মাথা ঘুরছে। পা টনটন করছে। গা-গতরে বাজছে।

আমি বললুম, "ঘোড়া, ঘোড়া, থাম।"

ঘোড়া বললে, "থামব কেন?"

আমি বললুম, "আমার গা-গতরে লাগছে, থাম।"

ঘোড়া বললে, "সে কী গা, যাবে না?"

আমি বললুম, "আমার মাথা ঘুরছে, থাম।"

ঘোড়াটা চিঁ-হিঁ-হিঁ করে হেসে উঠল।

"হাসিস কেন?"

"ঘোড়া বললে, থামতে আমি জানি না।" বলতেই দেখো, দেখো, কী জোর ঝড় উঠল। আকাশে মেঘ ছিল না, ঝড়ো মেঘে ছেয়ে গেল। কোত্থেকে ধুলো-বালি উড়ে আমার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ঘোড়া কিন্তু থামে না! আমি ধুলোতে দেখতেও পাচ্ছি না, ঝড়েতে শুনতেও পাচ্ছি না, ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতেও পারছি না। ঘোড়াটা

ছুটছে, লাফাচ্ছে আর চিঁ-হিঁ-হিঁ করে হাঁক দিচ্ছে।

আমি ধমক দিলুম, "এই ঘোড়া, থামবি?"

ঘোড়া চেঁচাল, "বুড়ি, ঝড়ে তোমায় শেষ করব! তোমার ঐ বাক্স নেব, তারপরে ছাড়ব।"

আমি বুঝলুম ঘোড়াটা আমায় বিপদে ফেলে মারতে চায়। আমি কোনরকমে তরোয়ালটা বার করে ঘোড়ার গলাটা ক্যাঁচ করে কেটে দিলুম। ওমা! ওমা! তবু ঘোড়াটা থামল না। মরল না। মাটিতে পড়ল না। গলা-কাটা ঘোড়াটা এবার সিধে ছোটা দিলে।

ছুটতে ছুটতে যখন বালি-বালি ঝড় একটু থেমেছে, দেখি, ঘোড়াটা আর ঘোড়া নেই। একটা উট। আমি একটা উটের পিঠে বসে আছি! সামনে মরুভূমি ধু-ধু! উটের পিঠে মরুভূমির ওপর দিয়ে আমি চলেছি। আশ্চর্য! হঠাৎ দেখি, এ এক রোদ ঝাঁ-ঝাঁ মরুর দেশ! বালি চিকচিক মরুর দেশ! আকাশে তাপ, বাতাসে তাপ। আমার গলা শুকিয়ে গেল। আমি বললুম, "এই উট, এই উট, জল খাব।"

উট বললে, "কোথায় পাব!"

আমি বললুম, "যেথায় পাস, সেথায় পাস, জল আমার চাই-ই চাই।"

উট বললে, "জল চাই? জল চাই? জল নাই! জল নাই!" বলে উটটা বালির ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল, নাচতে লাগল।

আমি বললুম, "উট রে, উট রে, থামরে, থামরে। প্রাণ আমার যায়রে, যায়রে।"

উট বললে, "মরলে তুমি ভালই হয়, বাক্স পাই।"

"ওরে উট, বাক্সের লোভ তোমারও! তবে দিই তোর মুণ্ডু দুখান করে।" বলে তরোয়াল দিয়ে খান খান করে দিলুম উটের মুণ্ডুটা।

ওমা! একটুও তো রক্ত বেরুল না! জল! জল! উটের গলা দিয়ে হু হু শব্দে শুধু জল বেরুচ্ছে। বেরুতে বেরুতে সে-জল ছড়িয়ে পড়ছে, গড়িয়ে চলছে!

গড়াতে গড়াতে একী ব্যাপার! সেখানে আর বালিও নেই, মরুও নেই। এদিকে থৈথৈ, ওদিকে থৈথৈ। চারিদিকে জল আর জল। মনে হচ্ছে যেন সামনে একটা জল থৈথৈ সমুদ্দুর! হ্যাঁ-তো রে! সমুদ্দুর আবার কোথায় ছিল! দেখি সমুদ্দুরের ওপর দিয়ে একটা নাও ভেসে যাচ্ছে। আমি চেঁচালুম, "ও মাঝি, ও মাল্লা, আমায় নিয়ে যাবে?"

মাঝি বললে, "কোথা যাবে?"

আমি বললুম, "যে-দেশের রাজার মেয়ের নাক চ্যাপ্টা, সেই দেশে।"

মাঝি বললে, "যাব।"

আমি তখন সেই নায়ে চেপে নাক চ্যাপ্টা রাজকন্যার দেশে চললুম।

ক'দিন পর রাজকন্যার দেশে পেঁাছে রাজাকে জিজ্ঞেস করলুম, "রাজামশাই, রাজামশাই, তোমার মেয়ের যদি নাক গজিয়ে দিই, কী দেবে?"

রাজা বললে, "যা চাও।"

"যা চাইব, তাই দেবে?"

রাজা বললে, "হ্যাঁ গো মেয়ে, তাই দেব।"

"আমি যদি হাতি চাই?"-

"হাতি দেব।"

"ঘোড়া চাই?"

"ঘোড়া দেব।"

"বাড়ি চাই?"

"বাড়ি দেব।"

"গাড়ি চাই?"

"গাড়ি দেব।"

"রাজামশাই, তোমার মাথার যদি মুকুট চাই?"

"মুকুট দেব।"

আমি তখন বললুম, "রাজামশাই, তুমি যদি সব দাও, তো তোমার কী দশা হবে?"

রাজা বললে, "মেয়ের নাক গজালেই সব হল। আমার মান বাঁচল। যদি মানই না থাকে তো কী হবে এত সব ধন-দৌলতে? রাজ্যপাটে?"

"বেশ, তা হলে সেই কথা। আমি তোমার মেয়ের নাক গজিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমি যা চাইব, তাই চাই কিন্তু!" বলে ঝুলি থেকে বাক্সটা বার করলুম।

রাজা বললে, "এটা কী?"

আমি বললুম, "এটাই তো সব। এতেই তো নাক!"

রাজা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, আমার বাক্সের দিকে।

আমি আঁচলে হাত বাড়ালুম। ওমা! আঁচলে বাক্সের চাবি কই? আঁচলেই তো বেঁধে রেখেছিলুম। নেই তো! কোথা গেল? এ-আঁচল দেখি, ও-আঁচল দেখি! কোমর দেখি! ঝুলি ঘাঁটি! যাঃ, চাবি নেই!

রাজা জিজ্ঞেস করলে, "কী খুঁজছ?"

"চাবি খুঁজছি।"

"কিসের চাবি?"

"বাক্সের চাবি।"

"কী বাক্স?"

"যাদু-বাক্স।"

"কী যাদু?"

"ফুস-যাদু।"

"দুস, দুস, দুস-যাদু! যত সব বাজে," বলে রাজা সিপাইকে ডাক দিলে! বললে, "ঝোলাঝুলি ফেলে দাও। বুড়িটাকে বাইরে যাবার পথ বাতলে দাও।"

বলতেই সিপাই আমার ঘাড় ধরে পথে বার করে দিল। আমার তো চোখের জল পড়তে বাকি। ছিঃ ছিঃ! কী হল! এত করে শেষ-কালে চাবিটা হারিয়ে ফেললুম। আমি কাঁদতে কাঁদতে চাবি খুঁজতে লাগলুম পথে পথে। সে চাবি কী আর পাই বাছা? কে জানে কোথায় পড়ল! শুকনির পিঠে যখন পাহাড়ে পড়ল, না ঘোড়ার পিঠে যখন মাটিতে হারাল, না উটের পিঠে যখন মরুতে খুইল।

খুঁজে পেলুম না। খুঁজতে খুঁজতে কত বছর কেটে গেল। আমার দাঁত পড়ল। চুল ঝরল। একটা চোখ কানা হল। চাবি পেলুম না, পেলুম না!

তখন কী করি, কী করি, বাক্সটা নিয়ে বাসা বাঁধলুম এই বনে। কেউ না জানতে পারে বাক্সের কথা, কেউ না দেখতে পায়। সেই থেকে বাক্সটা বুকে নিয়ে এইখানেই আছি। কে জানে, কত বছর হয়ে গেল।

বুড়ি চোখ ঘুরিয়ে বেড়ালের দিকে তাকাল। যাঃ! বুড়ির কোলে বেড়ালটা গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। বুড়ি বললে, "মেনি ঘুমুলি?" বলে বুড়িও হাই তুললে। ছেঁড়া মাদুরটা টেনে নিলে। কোল থেকে মেনিকে তুলে শুইয়ে দিল মাদুরটার ওপর। পিদিমটা ফুস করে নিভিয়ে দিয়ে মেনির পাশে নিজেও গড়িয়ে পড়ল।

এতক্ষণ সিন্দুকের আড়াল থেকে কান পেতে বাজনা গল্প শুনছিল। চাবির কথা শুনে বাজনার বুকটা ধক করে উঠল। গরু বদ্যি তো তাকে একটা চাবি দিয়েছে! একদম ভুলে গেছল বাজনা। সে তো চাবিটা ট্যাঁকে রেখেছে! তাড়াতাড়ি ট্যাঁকে হাত দিল বাজনা! না, আছে! এ চাবিটা ঐ বাক্সের নয় তো!

সিন্দুকের পাশ থেকে খুব চাপা গলায় ডাকলে, "টাট্টু, টাট্টু, বুড়ি শুলো।"

টাট্টু বললে, "চুপ, এখন কোন কথা নয়।"

আরও কিছুক্ষণ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে, চুপটি করে বসে রইল বাজনা।

একটু পরেই বুড়ি নাক ডাকাতে সুরু করে দিলে।

বাজনা বললে, "টাট্টু, শুনতে পাচ্ছ?"

টাট্টু গলার স্বর আরও চেপে বললে, "হুঁ, পাচ্ছি। আর একটু ডাকতে দাও।"

নাক ডাকাতে ডাকাতে বুড়ি যখন ঘুমে একেবারে অচেতন হয়ে গেল, তখন টাট্টু বললে, "বাজনা, এবার ভাল করে দেখো।"

বাজনা উঁকি দিলে। বাব্বা! যা অন্ধকার, কিছুই ঠাওর করা যায় না।

বাজনা বললে, "কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।"

টাট্টু বললে, "আস্তে আস্তে বেরিয়ে সিন্দুকের ডালাটা খুলে বাক্সটা বার করে নাও।"

বাজনা হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। নিঃসাড়ে সিন্দুকের ডালাটা খুলে ফেললে। বাক্সটা বার করে আবার ডালাটা চাপা দিয়ে দিলে। বললে, "টাট্টু, বাক্স পেয়েছি।"

টাট্টু বললে, "এবার ঐ তরোয়ালটা নাও।"

ঘরের দেওয়ালে তরোয়ালটা টাঙানো ছিল। চটপট সেটা খুলে কোমরে বাঁধলে।

টাট্টু বললে, "এবার খুব সাবধানে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়!"

টাট্টুর কথা শুনে, দেখে দেখে, খুব সাবধানে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল বাজনা। কিন্তু বরাতে বিপদ থাকলে কে রুখবে বল?

আর সে কী, বিপদ বলে বিপদ! বেড়ালকে ডিঙিয়ে বুড়িকে লাফাতে গিয়ে দেখতে পায় নি ঠিক-ঠিক। অন্ধকারে বেটক্কা মেরেছে বুড়ির গায়ে এক ধাক্কা!

আর দেখতে! বুড়ি একেবারে ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েছে। "কে-রে! কে-রে!" করে চিল-চেঁচিয়ে উঠল।

বুড়ির চেঁচানি শুনে বেড়ালেরও ঘুম মাথায় উঠেছে। তিড়িং করে লাফ মেরে "বাপরে বাপ' বলে হাঁক পাড়লে।

তাই না দেখে বাজনা দুড়দাড়িয়ে মার ছুট! ঘরের দরজা খুলে পগারপার!

বেড়াল চেঁচালে, "ঠাকমা গো, ঠাকমা, সেই ছেলেটা!" বলেই বেড়ালও ছুট দিল বাজনার পিছু পিছু। একেবারে তীরের মত। এই বুঝি বাজনাকে ধরে ফেলে।

বাজনা টাট্টুকে জিজ্ঞেস করলে, "কী করি?"

টাট্টু বললে, "তাড়াতাড়ি আমার কপালে চ্যাং-চ্যাং রাজার টিপটা ছুঁইয়ে দাও।"

টিপটা তো বাজনার কাপড়ের খুঁটেই বাঁধা ছিল। ছুটতে ছুটতে কোনরকমে ছুঁইয়ে দিল টাট্টুর কপালে। টিপও আটকাল টাট্টুর কপালে, সঙ্গে সঙ্গে আবার জ্যান্ত ঘোড়াও হয়ে গেল টাট্টু। বাজনা ঝটপট টাট্টুর পিঠে লাফিয়ে বসল। টাট্টু জোর কদমে দৌড় মারলে!

বেড়ালও ছাড়বে না। বেড়ালও ছুটছে। আশ্চর্য! ঐটুকু পুঁচকে বেড়ালের কী তেজ! ঘোড়ার সঙ্গে কেমন পাল্লা দিচ্ছে দেখো!

বাজনা বললে, "টাট্টু, টাট্টু, বেড়াল যে খুব কাছে, এই ধরল বলে!"

টাট্টু বললে, "ভয় পেও না। তরোয়াল দিয়ে বেড়ালের গলাটা কেটে দাও।"

দিয়েছে বাজনা "ঘ্যাঁচ"! বেড়ালের গলা দু'খান।

ওমা! বেড়ালটা তো মরল না। বেড়ালটা যে শেয়াল হয়ে গেছে! ছুটছে টাট্টুর পেছনে!

বাজনা বললে, "টাট্টু, টাট্টু, বেড়াল গেল, শেয়াল এল। কী সাংঘাতিক!"

টাট্টু জিজ্ঞেস করলে, "শেয়াল কতদূর?"

"তোমার পায়ের কাছে।"

"শেয়ালের গলাটাও দু'খান কর।"

সঙ্গে সঙ্গে বাজনা তরোয়াল চালালে, "ঘ্যাঁচ"!

ওরে বাবা! শেয়ালটা গাঁক করে ডেকে, একটা বাঘ হয়ে গেল যে!

বাজনা বললে, "টাট্টু, সব্বনাশ!"

টাট্টু জিজ্ঞেস করলে, "কী হল?"

"শেয়াল থেকে বাঘ এল!"

টাট্টু আরও জোরে ছুট মারল।

বাঘও ছুট দিলে।

বাজনা ভয়ে সিঁটিয়ে, খুব বাগিয়ে টাট্টুর গলাটা জড়িয়ে ধরলে। ভাবলে, আর রক্ষে নেই!

টাট্টু ছুটতে ছুটতে জিজ্ঞেস করলে, "বাঘ কতদূর?"

বাজনা বললে, "দূরে নয়, কাছে!"

"কত কাছে?"

"লাফ মারলেই টুঁটি ধরবে!"

টাট্টুর গায়ে যত জোর, সব জোর একসঙ্গে করে জোড় কদমে ছুট দিলে। কিন্তু পারবে কেন বাঘের সঙ্গে!

বাজনা কেঁদে ফেলল। বললে, "টাট্টু, টাট্টু, শেষে বোধ হয় বাঘের পেটে যেতে হয়!"

টাট্টু বললে, "কেঁদো না! কাঁদলে সব মাটি! এক কাজ কর, আমার কপাল থেকে টিপটা শিগগির তুলে নাও। নিয়ে বাঘের গায়ে ছুঁড়ে মার।"

যেমন বলা তেমন কাজ। বাজনা চটপট খুলে নিল টিপটা টাট্টুর কপাল থেকে।

যাঃ! টিপটা কপাল থেকে সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাট্টু যে থমকে দাঁড়িয়ে ছিটকে পড়ল! আবার যে কাঠের-ঘোড়া খেলনা হয়ে গেল! বাজনাও হুমড়ি খেয়ে টাট্টুর পিঠ থেকে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়েছে। আর রক্ষে নেই! বাঘও ঘাড়ের ওপর পড়ল বলে। বাজনাও বাঁচি-মরি চোখ-কান বুজে সাঁই করে ছুঁড়ে দিল টিপটা একেবারে বাঘের গায়ে। বাঘ মারলে লাফ, "গাঁক।" গিলে ফেললে বাজনাকে! যাঃ! বাজনা টাট্টুকে নিয়ে একেবারে বাঘের পেটে!

ওমা! কই বাঘ? বাঘ তো নেই!

তবে?

বাজনা বাঘের গায়ে যেই টিপটা ছুঁড়ে মেরেছে, বাঘটা যে অমনি ফানুস হয়ে আকাশে উড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে! একি বাবা!

কী সব্বনাশ!

ফানুস উড়ছে। ফানুসের সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে বাজনাও উড়ছে।

এই রে! কী হবে?

ফানুস সাঁ সাঁ করে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। ওপরে উঠছে। আরও ওপরে। তারপর হয়তো আকাশে হারিয়েই যাবে!

ভয়ে একেবারে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল বাজনা।

টাট্টু বললে, "বাজনা, কাঁদলে আরও বিপদ। বিপদে বুদ্ধি

হারালে মুশকিল। বুড়ির বাক্সটা তো তোমার হাতেই আছে। বদ্যির চাবি দিয়ে দেখো-না বাক্সটা খোলা যায় কিনা! বলা যায় না, কী থেকে কী হয়! বুড়ি বলেছে বাক্সের ভেতর সব আছে। দেখো, ওর ভেতর হয়তো বিপদ থেকে বাঁচার উপায়ও থাকতে পারে।"

টাট্টুর কথা শুনে চোখের জল সামলে নিয়ে, বাজনা নাকের জল টানতে টানতে চটপট ট্যাঁক থেকে চাবিটা বার করলে। বাক্সে লাগালে!

দেখো! দেখো! কী বরাত! চাবি লেগেছে! চাবি লেগেছে! বাক্সও খুলে গেছে!

ইস! এ আবার কী কাণ্ড! কোথায় এত ধোঁয়া ছিল? খুলতেই ঐ ছোট্ট বাক্সটার ভেতর থেকে হুস হুস করে বেরিয়ে আসছে! চোখ চাইতে পারছে না বাজনা। গলায় ধোঁয়া আটকে দম বন্ধ হয়ে আসছে! এই দেখো, আবার বুঝি আর এক কাণ্ড হয়!

না, আর কিছু হল না। ধোঁয়া বেরুতে বেরুতে ফুরিয়ে গেল

ঝকমকে বাক্সের ভেতরটা কেমন ঝিলমিল করে উঠেছে!

কিন্তু একী!

কী? কী?

চমকে ওঠে বাজনা।

কেন?

বাক্সের ভেতর কার ছবি যেন!

হ্যাঁ, বাজনা স্পষ্ট দেখতে পেল তার মায়ের ছবি বাক্সের ভেতর ঝলমলিয়ে ভেসে উঠেছে! মা চুপচাপ বাজনার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দিয়ে মা'র টুপটুপ জল গড়াচ্ছে। মা কাঁদছে। ডাকছে না বাজনাকে। শুধু দেখছে!

আঁতকে উঠল বাজনা। এতদিন মায়ের কথা একদম ভুলে গেছল বাজনা। চিৎকার করে কেঁদে উঠল বাজনা, "মা-আ-আ।"

মা কথা বললে না। ছলছল চোখে চেয়েই রইল।

কিন্তু এই যাঃ! ঠিক তক্ষুনি বাক্সটা বাজনার হাত থেকে ফস্কে গেল। মা-ও হারিয়ে গেল! আকাশে ফানুসটা উড়ছে আর বাক্সটা মাটিতে পড়ছে।

"না-আ-আ-আ।" কী ভয়ঙ্কর চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছে বাজনা।

কাঁদলে কী আর বাক্স থামে!

"দুম-ম-ম-ম!" মাটিতে পড়ল বাক্সটা। কী বিকট আওয়াজ!

ওমা! সঙ্গে সঙ্গে ফানুসটাও ফ-ট-ট-ট! ফেটে গেছে! এই রে!

ফাটা ফানুসটা বাজনা আর টাট্টুকে নিয়ে ঐ উঁচু আকাশ থেকে যেন হোঁচট খেতে খেতে নিচে পড়ছে। এক্ষুনি মাটিতে ছিটকে পড়বে। ফানুসের সঙ্গে ডিগবাজি খেতে খেতে বাজনাও পড়ছে, টাট্টুও পড়ছে। এবার নির্ঘাৎ সব শেষ!

সত্যি! আকাশ থেকে মুখ থুবড়ে বাজনা মাটিতে পড়ল! আঃ! শেষবারের মত কেঁদে উঠল, "মা-আ-আ।" তারপর সব চুপ!

হঠাৎ মায়ের মিষ্টি হাতের ছোঁয়া লাগল বাজনার মাথায়। মা ডাকলে, "বাজনা, বাজনা, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁদছিস কেন?"

ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ল বাজনা। অবাক হয়ে মায়ের চোখের দিকে চেয়ে রইল। ভয়ে মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরলে দু' হাত দিয়ে। জিজ্ঞেস করলে, "মা, আমি কোথায়?"

মা বললে, "কেন, এই তো আমার কাছে!"

বাজনা বললে, "আমার ভয় করছে মা!"

"ভয় কেন রে! এই তো আমি আছি।" বলে মা আদর করে বাজনার গালে চুমু খেয়ে ডাকল, "বাজনা, লক্ষ্মী-সোনা।"

চমক লাগল বাজনার। চোখের পাতা দুটি তার কেমন যেন নেচে উঠল। মায়ের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

মা বললে, "কি দেখছিস?"

বাজনা গলাটি জড়িয়ে ধরল মায়ের। চোখের দিকে চেয়ে বললে, "মা, আর একবার ডাক, আমার নাম ধরে।"

মা অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে বাজনার চোখের দিকে। বললে, "কেন রে?"

বাজনা বললে, "এমনি। ডাক না।"

হেসে ফেললে মা। মিষ্টি-সুরে মা ডাকলে, "বাজনা!"

বাজনা আব্দার করলে, "আর একবার।"

"পাগল ছেলে!" বাজনাকে বুকে টেনে নিলে মা। সবটুকু আদর যেন উপচে পড়ল মায়ের মুখ দিয়ে, "বাজনা, বাজনা, বাজনা।"

আঃ! আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল বাজনার বুকখানি। ঠিক তক্ষুনি তার মনে হল, এমন সুন্দর নাম পৃথিবীতে আর কারো নেই। মায়ের আদর যেমন মিষ্টি, তার নামটাও তেমনি মিষ্টি! মা যে-নামে ডাকে সেই নামই তো সবচেয়ে সুন্দর! সবচেয়ে ভাল!

মায়ের বুকে মুখ লুকিয়েই বাজনা আড়চোখে দেখল ঘরের দেরাজটার দিকে। হ্যাঁ, ঐ তো টাটু বসে আছে। বসে বসে যেন বাজনাকে দেখে মুচকি মুচকি হাসছে আর চোখ টিপছে। কী দুষ্টু দেখো!